চন্দ্রযান-৩-র সফল উৎক্ষেপণ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, মে-জুন, ২০২৩ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

৪ মে '২০২৩

প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নবান্ন অভিযান

৪ মে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচীতে শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক- শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের মেজাজ, ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চরিত্র রাজ্য প্রশাসনকে মানসিকভাবে হার মানতে বাধ্য করল। অভিযানকারীদের শারীরিক ভাষায় একথাই পরিস্ফুট হল, আর যাই হোক হুমকি দিয়ে বদলী করে, আক্রমণ করে দাবি না মেনে কর্মচারী সমাজ সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চকে নতজানু করা যাবে না। বাম সরকার পূর্ববর্তী সময়ে যারা চেষ্টা করেছিলেন তারা সফল হননি, বর্তমানে যার চেষ্টা করছেন তারাও সফল হবেন না। নিজেদের হকের দাবি সহ রাজ্যের জনগণের সার্বিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ প্রতিনিয়ত লড়াই আন্দোলনে সামিল থাকবে।

৯ জুলাই ২০১৫ মৌলালী যুবকেন্দ্রে কনভেনশন থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত ২৮টি সংগঠন যুক্ত হয়ে যৌথ মঞ্চ গঠিত হওয়ার পরবর্তীতে নিজেদের দাবি দাওয়া সহ সার্বিক জনগণের দাবি আদায়ে এ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক- শিক্ষাকর্মীরা বারে বারে তাদের লড়াই আন্দোলন জারি রেখেছে। ইতিপূর্বে ১১ এপ্রিল ২০১৭ সংগঠনের পক্ষ থেকে নবান্ন অভিযান কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছিল। যদিও সে সময় তাৎক্ষণিকভাবে রাজ্যের তৎকালীন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভাতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেছিলেন ঐ দিনই কর্মসূচী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে। তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

সমাবেশের একাংশ

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মে দিবসের শপথ

সংগ্রাম তীব্রতর করতে হবে

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমজীবী মানুষের কাছে শপথ নেবার দিন। এই বছর ভারতে মে দিবস পালনের শতবর্ষ। ১৯২৩ সালে তদানীন্তন মাদ্রাজে মে দিবসের লাল পতাকা তুলেছিলেন এম সিঙ্গারাভেলু। এই ১০০ বছর ধরে চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজও সমানভাবে লড়ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্গত বিভিন্ন সমিতি ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তরগুলিতে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল ঐতিহাসিক মে দিবস। কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয় দুপুর ৩টায়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। তারপর কর্মচারী ভবনের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে সভার কাজ শুরু হয়। মানস দাস সভার কাজ পরিচালনা করেন। প্রথমেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, ‘‘এই সময় যৌথ আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করা প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ১০ মার্চ অভূতপূর্ব ধর্মঘট হয়েছে। যে তিন দফা দাবিতে ধর্মঘট হয়েছে তা এখনও অর্জিত হয়নি। তাই আমরা যৌথ মঞ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি আগামী ৪ মে নবান্ন অভিযান কর্মসূচী করব। পুলিশ প্রশাসন শাসক দলের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। তাই আক্রমণ আসবে, প্রতিবন্ধকতা আসবে। তাকে অতিক্রম করেই আমরা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাব। মানুষের স্বার্থে যেমন আমাদের আন্দোলন, কর্মচারী স্বার্থে যেমন আমাদের আন্দোলন, তেমন পশ্চিমবঙ্গে হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বাতাবরণ ছিল তাকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনেও আমাদের সামিল হতে হবে। সেই লক্ষ্যেই যৌথ মঞ্চ এগিয়ে চলছে। রাজ্য সরকার বলছে কর্মচারীদের যদি ডি.এ দিতে হয় তবে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সাধারণ মানুষের সাথে কর্মচারী সমাজের বিভাজন তৈরি করার গভীর ষড়যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। মুখ্যসচিবের সাথে যখন আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন সুনির্দিষ্টভাবে আমরা বলেছিলাম গ্রামীন বাংলার মানুষকে আরো বেশি করে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক। ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে আরো আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হোক। পাশাপাশি রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের বকেয়া মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ দেওয়া হোক। দেশের মধ্যে ১৭টি রাজ্য উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেও ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান করেছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে অন্তরায় কোথায়? পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহের খাতগুলো এখন লুঠেরাদের হাতে চলে গেছে। এই লুঠ, সন্ত্রাসের থেকে মানুষের অধিকার রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাই ৪ মে-এর নবান্ন অভিযানকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে হবে। পুলিশ প্রশাসন এই অভিযানকে বানচাল করার নানা অপচেষ্টা করছে। বলছে ব্যস্ত সময়ে রাস্তা আটকে মিছিল করলে মানুষের অসুবিধা হবে। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটি দায়িত্বশীল সংগঠন। শ্রমিক, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে মিছিল সাধারণ মানুষের সমস্যা বা অসুবিধার জন্য নয়। আমাদের থেকে আর কেউ সেটা ভালো বোঝে না। তবে যদি মেকি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয় তবে তা ভেদ করার শক্তি শ্রমিক কর্মচারীর আছে। আমাদের মোবাইল জলে ছুড়ে ফেলে দিতে হয় না, রাতের অন্ধকারে নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হয় না। আমরা

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

প্রবীর মুখার্জী

রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন সভাপতি মানস দাস

● অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

আদালতেও ধাক্কা খেল সরকার

গত ৪ মে বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ তিন দফা দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী চল্লিশটিরও বেশী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। হাওড়া ফেরিঘাট থেকে মিছিল শুরু হয়ে নবান্ন অভিমুখে এগিয়ে যাবে মিছিল—এটাই ছিল ঘোষিত কর্মসূচী। দেশের সংবিধান এবং কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিধিতে প্রদত্ত অধিকারের ভিত্তিতেই এই কর্মসূচীর ডাক দেওয়া হয়েছিল। নিজস্ব আর্থিক দাবির সাথে জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত দুটি দাবিকে যুক্ত করে ‘নবান্ন অভিযান’ কর্মসূচীকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে (মূলত পথচলতি পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য) নির্দিষ্ট দিনের বেশ কিছুদিন আগেই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

চিঠি প্রাপ্তির পর বেশ কয়েকদিন নীরব থেকে, ২৯ এপ্রিল হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ (হেড কোয়ার্টার্স) লিখিতভাবে জানান যে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে ৪ মে প্রস্তাবিত মিছিলের অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণগুলির মধ্যে রয়েছে নবান্ন অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলে ১৪৪ নং ধারা জারি থাকা, মিছিলের প্রস্তাবিত রুটটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় যানজট তৈরী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং সরকারী দপ্তর ও স্কুল খোলা থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রী ও অফিসযাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা হবে। স্পষ্টতই শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে বিধি নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক কিছু ভিত্তিহীন কারণ দেখিয়ে মিছিলের অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে।

পুলিশ প্রশাসনের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে যৌথ মঞ্চের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে। ২ মে মাননীয় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে

● অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের জীবনাবসান ঘটেছে। গত ২৮ জুলাই '২৩ শুক্রবার ভোররাতে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তিনি প্রয়াত হন, বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩ নভেম্বর এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নয় বছর বয়সে তার পিতার চাকরির কারণে ভিন রাজ্যে চলে যেতে হলেও স্কুলের পড়াশোনার কারণে তিনি মামা বাড়িতে থেকে যান। তার দুই মামা বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তিনি বামপন্থী পরিমণ্ডলেই বড় হতে থাকেন। বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা শেষ করে অর্থ উপার্জনের জন্য গৃহশিক্ষকতা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিক্রয়ের কাজ করেছেন। কিছুদিন পরে ছোটখাটো চাকরির প্রয়োজনে সোনারপুরে কাকার বাড়ি থাকা শুরু করেন। এই সময় থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন ও কমিউনিস্ট

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী

এসো রক্তের বন্ধনে বাঁধি প্রাণ

গত ২৮ জুলাই ২৩ কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হল কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী। রক্তদান জীবন বাঁচায়। যাদের রক্তের প্রয়োজন আছে তারা সময়মতো সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুলভে রক্ত পান তা সুনিশ্চিত করতে রক্তদানে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধক বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অনুপ রায় একে অপরের পাশে দাঁড়াবার পরামর্শ দেন। ডাক্তার রায় সব ধরনের সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি করে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করার অনুরোধ জানান। এর ফলে রক্তের মজুতের পরিমাণ সঠিক মাত্রায় বজায় থাকবে বলে তিনি জানান। মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। এর ফলে আগামী দিনে রক্তদান আন্দোলন আরো গতি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রক্তদান কর্মসূচীর কোনো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা যায়নি। কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন প্রবীন নেতৃত্ব রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক ও ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক কমরেড সমীর ভট্টাচার্য আজ ভোর রাতে প্রয়াত হন। গোটা নেতৃত্ব সহ অসংখ্য মানুষ শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কর্মচারী ভবনে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তার মরদেহবাহি শকট কর্মচারী ভবন থেকে চলে যাবার পর রক্তদান কর্মসূচীর কাজ শুরু হয়। স্বাভাবিক ভাবেই রক্তদান কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক

উদ্বোধক ডাঃ অনুপ রায়কে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী উপস্থিত আছেন যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়

● অষ্টম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

সম্পাদকীয়

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর বিনষ্টকারী শক্তির সক্রিয়তা বাড়ছে

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার মধ্যে তাদের নিজস্ব আর্থিক সহ অন্যান্য দাবিদাওয়া ছাড়া অন্য কোনো দাবি থাকা উচিত নয়, এমন কেউ কেউ মনে করে। তারা মনে করে মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীদের 'আদার ব্যাপারী' হিসাবেই থাকা উচিত। এই রাজ্যে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন যখন থেকে সঠিক দিশায় পথ চলা শুরু করেছে তবে থেকেই কর্মচারীদের মধ্যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার শাসক শ্রেণী এবং তাদের তল্পি বাহকদের পক্ষ থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের একটা অংশ এর দ্বারা একদম যে বিভ্রান্ত হন না তা বলা যাবে না। কিন্তু রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ বৃহত্তর সমাজের অঙ্গ হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই যে আদার ব্যাপারী নয়, সেটা বাস্তব সত্য। অতীতের অনেক উদাহরণ না দিয়ে বর্তমান সময়কে ধরেই একটা-দুটো কথা বলব।

আজ এই মুহূর্তে মণিপুরের একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী কি নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোতে পারছে? তারা কি তাদের বকেয়া আর্থিক দাবিগুলির জন্য লড়াইয়ে নামার কথা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে? পারছে না। কারণ এই মুহূর্তে জাতিগত দাঙ্গায় মণিপুরবাসীর স্বাভাবিক জনজীবন বিধ্বস্ত। আর সমগ্র মণিপুরবাসীর একটা অংশ হিসাবে সেই রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত। তাহলে মণিপুরের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের মতেই সেখানকার একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও অপেক্ষা করছে মণিপুরে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসার। তাঁরাও মণিপুরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার দাবি করছেন। একই কথা এই মুহূর্তে দাঙ্গা বিধ্বস্ত হরিয়ানার নুহ ও গুরুগ্রামের একজন সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের দাবি সনদে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার দাবি রাখাটা 'জাহাজের খবর রাখার' সমতুল নয় বরং স্বাভাবিক। কারণ অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি, তেমনি অর্জিত অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে যে কোনোরকমের বিভাজনের প্রক্রিয়া চরম ক্ষতিকারক। তাই তো আমাদের অর্থাৎ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং যৌথমঞ্চের দাবি সনদে এই সংক্রান্ত দাবি গুরুত্ব সহকারে উত্থাপিত হয়। ক্রমিক হিসাবে এই দাবিগুলি হয়তো শেষে থাকে, কিন্তু সময়ের চাহিদায় এগুলি কখনো কখনো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সময় আমাদের বিভাজনের রাজনীতির অন্দরমহলে উঁকি দিতেই হয়।

বিভাজনের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য মানুষেণ মধ্যে ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া। কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি ও তার পরিচালক আর এস এস-এর রাজনীতির মূল মতাদর্শ হল হিন্দুত্ব। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানো, হিন্দুরাই এদেশে রাজ করবে আর অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষত মুসলীম সংখ্যালঘুরা তাদের অধীন হয়ে থাকবে। তাদের কোনো সমনাধিকার থাকবে না। ওরা যেখানে সুযোগ পায় সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের তাস খেলা শুরু করে। মণিপুরে প্রায় সাড়ে তিনমাস ধরে জাতিদাঙ্গা চলছে তার পিছনেও এই রাজনীতি আছে। মণিপুরে বর্তমানে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। এটা বলা যাবে না যে মণিপুরে জাতিগত অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ, সংঘর্ষ এই প্রথম ঘটছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই সীমান্ত রাজ্যে ৩৬টি জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত গোষ্ঠী বসবাস করে। এদের মধ্যে তিনটি প্রধান ভাগ করা যায়। ইম্ফল উপত্যকা কেন্দ্রীক মেইতেই গোষ্ঠী। যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা তাদের নিজস্ব সনামাহি ধর্মাবলম্বী। দ্বিতীয় ভাগে আছে কুকি ও নাগা, যারা মূলত খ্রীস্টান। এদের ছাড়া রয়েছে বাকি ছোটো উপজাতি গোষ্ঠীগুলি এবং অন্যান্য রাজ্যের অদিবাসীরা। দীর্ঘকাল থেকেই সেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মাঝে মাঝেই সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। অতীতে নাগা ও কুকিদের মধ্যেও সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু ২০১৭ সালে বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই সংঘর্ষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। ২০১৭-র পর থেকে আর এস এস এবং তার শাখাগুলি মেইতেই-দের হিন্দু পরিচিতি সত্ত্বাকেই প্রাধান্য দিয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে সক্রিয় হয়। বর্তমানে মেইতেই জনগোষ্ঠী ও কুকি জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ হিন্দু-খ্রীস্টান সংঘর্ষের চেহরা দিতে তারা সক্রিয়। এর একটা অতীত আছে। মায়ানমারে ২০২১-এ সেনা অভ্যুত্থানের পর সেখানটার কয়েক হাজার শিন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে মণিপুর ও মিজোরামে আশ্রয় নেয়। শিন আর কুকি একই জাতিগোষ্ঠী। এদেরকে কুকিরা সাদরে গ্রহণ করে, কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এদের উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। এটা কুকিদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বর্তমানে মণিপুরের বিরেন সিং সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উচ্ছেদ কর্মসূচীর দ্বারা আক্রান্ত হয় বিরাট সংখ্যক কুকি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। আর এস এস-বিজেপি মেইতেইদের মধ্যে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর নেতাদের কুকিদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে প্রচার করে যে তারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী।

এই সময়কালে এটাও প্রকাশ্যে আসে যে ২০১৭-র বিধানসভা এবং ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য কুকি চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতার সাহায্য চেয়েছিল বিজেপি। জুন ২০১৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কুকি চরমপন্থী নেতা এস এস হোকিপ-এর লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রকাশ্যে আসে। এর দ্বারা বিজেপি-আর এস এস-এর এই দ্বিমুখী খেলা মেইতেইদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষের বলি প্রায় দেড় শতাধিক, ঘরছাড়া, রাজ্যছাড়া প্রায় এক লক্ষ মানুষ। বিভাজনের রাজনীতিতে প্ররোচিত হয়ে মানুষ কতটা নৃশংস, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ মণিপুরে নারীদের উপর অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন। বিবস্ত্র করে নারীদের প্রকাশ্যে ঘোরানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আশার পর দেশবাসী শিহরিত হয়েছে।

মণিপুরের ঘটনাবলী বিভাজনের রাজনীতি এবং একই সাথে এই রাজনীতির দ্বিচারিতা উন্মুক্ত করেছে। যাদের খ্রীষ্টান, ভিনদেশী বলে মেইতেইদের বোঝানো হচ্ছে, আবার নির্বাচনে জয়ী হতে তাদের সহায়তা চাওয়া হচ্ছে। একেই বলে দ্বিচারিতা। পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হচ্ছে সুদূর নাগপুর থেকে। কাজেই কারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামই মূল কথা। এই সংগ্রামের সাফল্যের অনুসারী হিসাবেই অর্জিত হতে পারে নিজস্ব দাবিদাওয়া। অবশ্য তারও কিছু পূর্ব শর্ত থাকে।

মনে রাখতে হবে ২০২৩ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আর এস এস-বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিকে তুরুপের তাস করবে। হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ২০২৪-এ। সেই রাজ্যের নুহ, গুরুগ্রামে দাঙ্গা লাগানো হয়েছে। সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যের বিজেপি সরকার বুলডোজার দিয়ে সংখ্যালঘুদের বৈধ দোকানপাট, বাড়ি গুড়িয়ে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও ধর্ম, কোথাও জাতপাতকে ব্যবহার করে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বিভাজনের শক্তি মানুষকে বিভাজিত করে তাদের ঐক্য বিনাশ করতে চায়, এটা যেমন সত্য, আবার এই শক্তিই মানুষকে ধর্ম, জাতপাতের মোহে নিবিষ্ট করে শাসকশ্রেণীর হয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। তাই আজ কর্পোরেট মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ এক হয়েছে। একদিকে শ্রমজীবীরা আক্রান্ত হচ্ছে নানাভাবে। মূল্যবৃদ্ধি সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় হ্রাস, বেকারী বৃদ্ধি হচ্ছে, অপরদিকে লোকসভায় একটার পর একটা সর্বনাশা বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অরণ্য সংরক্ষণ আইন সংশোধনী, খনি ও খনিজসম্পদ আইন সংশোধনী পাশ করার মধ্য দিয়ে বনভূমির উপর বনবাসীদের অধিকারের উপর আক্রমণ যেমন নামিয়ে আনা হচ্ছে, আবার দেশের খনিজ সম্পদ বিশেষত লিথিয়ামকে বেসরকারী ক্ষেত্রের লুটের জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীরা এই আক্রমণের গর্জে উঠলে "জ্ঞানব্যাপী মসজিদ চত্বরে মন্দির নির্মাণ, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি বাতিল"—ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে তাদের উপরে চালিত করতে চাইছে।

অতএব নিজস্ব সমস্ত দাবিদাওয়াকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েও পরিস্থিতির অন্যান্য বিপদগুলি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেড় শতাধিক মানুষ খুন হয়েছে। শাসক দল ভোট লুট ও ভোটগণনা কেন্দ্রে কারচুপি করে জয়ী হয়েছে এটা প্রকাশ্যে এসেছে। একই সঙ্গে ২০১৮ আর ২০২৩ যে এক নয়—তাও সাধারণ মানুষ, বিশেষত গ্রামবাংলার মহিলারা গণতন্ত্র রক্ষায় তাদের জানকবুল লড়াই দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। বিভাজনের শক্তি বিজেপি-আর এস এস এই রাজ্যেও সক্রিয়। নানাভাবে এরা মানুষের মধ্যে বিভাজনের প্ররোচনা সৃষ্টি করছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইতে সাধারণ মানুষের সাথে আমাদের সামিল হতে হবে। একই সাথে কর্মচারী ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ ও আরও জোরদার করতে সবরকমের বিভেদের শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামও জারি রাখতে হবে।

আক্রমণের কেন্দ্র যেহেতু জাতীয় স্তরে তাই দেশের সব প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির এক হওয়া প্রয়োজন। কারণ দেশের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোই আজ আক্রান্ত। সংবিধানের মৌলি ভিত্তিকে রক্ষা করাই এখন সবার কর্তব্য। আশার কথা প্রথমে পাটনায় ১৫টি ও পরে ২৬টি রাজনৈতিক দল ব্যাঙ্গালোরে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ইস্যুতে I-N-D-I-A নামের এক যৌথ মঞ্চ গঠন করেছে। সারা দেশের গণতন্ত্রপ্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ একটা ইতিবাচক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। □

১১ আগস্ট ২০২৩

কমরেড মদন ঘোষের জীবনাবসান

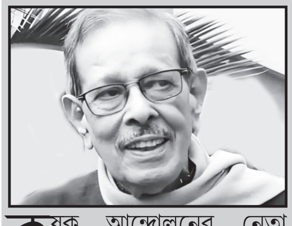

কৃষক আন্দোলনের নেতা সিপিআই(এম)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড মদন ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে। ২১ এপ্রিল সকাল ৭.১০ মিনিট নাগাদ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমানে বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। প্রয়াত নেতার মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে দান করা হয়। কমরেড মদন ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আস্থাশীল মাটির কাছাকাছি থাকা একজন বিনম্র স্বভাবের ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি এবং সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হিসাবে সারা দেশে কৃষক আন্দোলনের প্রসারে ভূমিকা পালন করেছেন। এক সময়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি কমিশনে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছয়ের দশকে এবং সাতের দশকে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময়ে দীর্ঘদিন আত্মোগোপনে থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। এছাড়াও বর্ধমান শহরে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে পার্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ২০০৮ সালে কোয়েম্বাটোরে পার্টির ১৯তম কংগ্রেস থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। সারা ভারত কৃষক সভার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব এবং কৃষক সভার সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন দীর্ঘদিন। এক কথায় তিনি ছিলেন কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা।

এ রাজ্যে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনে বামফ্রন্ট সরকারের নানা পরিকল্পনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কৃষক ও কৃষকদের উন্নয়নে 'সংকল্প' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্থাপনে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কৃষির বিকাশ নিয়ে তাঁর একটি পুস্তিকা কৃষি ভাবনার সন্ধান দেয়। শুধু 'সঙ্কল্প' প্রতিষ্ঠা নয়, সাধনা প্রেস নতুন চিঠি পত্রিকা, চিলড্রেন্স কালচারাল সেন্টারের মতো বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি উদ্যোগী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য গণশক্তি পত্রিকা দুর্গাপুর সংস্করণ চালু করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। □

প্রয়াত কমরেড মৃদুল দে

সিপিআই(এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য কমরেড মৃদুল দে গত ২৪ এপ্রিল ২০২৩, সোমবার রাত ১১.৩০ মিনিটে রাজারহাটে একটি বেসরকারী হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। গত ২০২৩ জানুয়ারি মাস থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন।

ছয়ের দশকে ও সাতের দশকের গোড়ায় ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তিনি। দু'বার জেলবন্দিও হতে হয়েছিল তাঁকে। ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৪৭ সালের ৯ জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ যোগেশ চন্দ্র দে। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক হন মৃদুল দে। পরবর্তীকালে ১৯৬৮ সালে তিনি শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় এম.এস.সি পড়তে ভর্তি হন। ঐ সময়েই তিনি ছাত্র আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। বিভিন্ন নির্বাচনে বিশেষ করে ছাত্রদের নির্বাচনে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে ছাত্রদের পরামর্শ দিতেন।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে দৃঢ়তার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তার উন্নত চেতনা ছিল। সাংবাদিক হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গণশক্তি পত্রিকায় দীর্ঘদিন তিনি মুখ্য সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি ষাটের দশকের শেষে ও নয়ের দশকের গোড়ায় পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবহুল পর্বে, সোভিয়েত বিপর্যয়ের সময়ে তিনি সেখান থেকে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন গণশক্তির জন্য যা বহুল প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি সাংবাদিক হিসাবে বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নানা কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। গণশক্তি পত্রিকার প্রভাতী সংস্করণের প্রকাশে, পত্রিকার উন্নয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। গণশক্তির পত্রিকায় নিয়মিত লেখক চিলেন। মুজফফর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার কমিটির সভাপতি হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। গণআন্দোলনের পাশাপাশি প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তার লেখা রাজনৈতিক বহু বই ও পুস্তিকা রয়েছে। □

প্রয়াত নরনারায়ণ গুপ্ত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল কমঃ নরনারায়ণ গুপ্ত বিধাননগরে তার নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন।

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী কমরেড নরনারায়ণ গুপ্ত বিদ্যালয় জীবন কেটেছে বালিগঞ্জ গর্ভনমেন্ট হাইস্কুলে ছোটবেলা থেকেই তার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বামপন্থী মতাদর্শে আকৃষ্ট হন এবং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর ১৯৫০ এর দশকে তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতার ফেরেন। ১৯৬১ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আইন পেশায় সঙ্গে যুক্ত হন। গরীব মানুষের স্বার্থে আইন পেশোকে কাজে লাগানো শুরু করেন। আইন পেশার সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। বিলেতে থাকাকালীন সেখানকার বহু অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর সঙ্গেই তিনি লেখক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর লেখা 'আদালতের ঘরে বাইরে এক আইনজীবীর ফিরে দেখা' বইটি এখনও পাঠকের কাছে জনপ্রিয়। তাঁর লেখা সিলেকটেড ট্রিবিউটস টু লিগ্যাল লুমিনিয়াস অ্যান্ড দ্য গভর্নর অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বইটিও খুব জনপ্রিয়।

তিনি হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। অন্যদিকে তিনি অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স ইউনিয়নের (এ আই এল ইউ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তার পরিবারে রয়েছেন পুত্র, পুত্রবধূ, দুই কন্যা, জামাতা এবং নাতি-নাতনিরা।

বিগত ১৮ জুলাই '২৩ হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে প্রয়াত নরনারায়ণ গুপ্তর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় হাইকোর্ট সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। স্মৃতিচারণা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায় চৌধুরী, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য প্রমুখ। স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী। □

সুকান্ত চৌধুরী

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য

শুধু ফলাফলের বিরুদ্ধে নয় নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে হবে

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর

কে হেমলতা
(সহ-সভাপতি, সি আই টি ইউ)

আমাদের এখানকার মতো অন্যান্য দেশেও এরকম আন্দোলন দেখা যাচ্ছে এবং সেখানকার শ্রমিকদের দাবিগুলিও একই রকম। আমাদের এখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলির যে যৌথ আন্দোলন আমরা ধারাবাহিকভাবে করে চলেছি তার দাবি সনদে কি আছে? মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা আছে, চুক্তি শ্রমিকদের দাবি আছে—নিয়মিতকরণ এবং সম কাজে সম বেতন, ন্যূনতম মজুরি, মহার্ঘভাতার বিষয়, পেনশনের বিষয়, শ্রম কোড বাতিল করে শ্রম আইন চালু করা ইত্যাদি। আজকে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও, সে ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্র হোক বা লাতিন আমেরিকা, সব জায়গাতেই মজুরি বৃদ্ধির জন্য, মূল্য বৃদ্ধির জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত বেতনের ক্ষতিপূরণের দাবিতে লড়াই হচ্ছে। শ্রমিকদের অর্জিত সুযোগ সুবিধাগুলি রক্ষা ও ঠিক ভাবে প্রয়োগের জন্য তারা দাবি করছে। তারা শ্রমের ঘন্টা কমানোর জন্য, শ্রম অধিকার রক্ষার কথা বলছে। আমাদের মতোই ফ্রান্স এবং নানা দেশে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। একদিকে দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ও সম্পদ সুরক্ষিত করার জন্য যেমন নয়া উদারনীতি প্রয়োগ করে শ্রমিকদের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তেমনি শ্রমিকরা দুনিয়া জুড়ে এসবের বিরুদ্ধে ব্যাপকতর, দীর্ঘমেয়াদী এবং জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলছে। এটা একটা তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য এবং এটা দেখিয়ে দিচ্ছে ব্যবস্থাটার মধ্যেই গলদ আছে—এটা পুঁজিবাদের কোনো সাময়িক সংকট নয়, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্গত সংকট। সে জন্য তাদের কাছে আর কোনো বিকল্পও নেই। ৭০ এর দশকে যখন সংকট দেখা দিয়েছিল তখন তারা নয়া উদারনীতি নিয়ে এল। তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংকটের মোকাবিলায় কেইনসীয় নীতি আনা হয়েছিল। নয়া উদারনীতি যে সংকট কাটাতে ব্যর্থ এটা এখন প্রমাণিত। এমনকি আই এম এফ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে নয়া উদারনীতির অনেক বিষয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নয়া উদারনীতির উত্থানের পর সংকট প্রথমে একটা দেশের ভিতর একের পর এক ক্ষেত্রে, তারপর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনো বিকল্প না থাকলেও আমাদের হাতে এই ব্যবস্থার বিকল্প আছে।

কাল, পরশু বা পরের কোনোদিনই তারা কোনো বিকল্প হাজির করতে পারবে না। সেইজন্য ইতোমধ্যেই তারা মূল বিষয় থেকে মানুষের চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। শ্রমিকদের ঐক্য যাতে ভেঙে যায় সেই লক্ষ্যে এক অংশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে অন্য অংশকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন বিজেপিকে সহযোগিতা করছে কর্পোরেটরা। কেন তারা সহযোগিতা করছে? সারা পৃথিবী জুড়েই দক্ষিণপন্থীদের উত্থান হচ্ছে। যেখানে উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই, লড়াইয়ের সামনে সঠিক বিকল্পের দিশা নেই, সেখানে শ্রমিকশ্রণীর লড়াইয়ের থেকে লাভবান হচ্ছে দক্ষিণপন্থীরা। অতীতে ইতালিতে মুসোলিনীকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল দক্ষিণপন্থী শক্তি। ফ্রান্সে এখন যদিও ম্যাকরোঁ ক্ষমতায় রয়েছেন, কিন্তু প্রধান বিরোধী দল লা পেনের পার্টি। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প পরাজিত হওয়ার পরও বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাঁর প্রচুর সমর্থক রয়েছেন। ব্রাজিলে বোলসোনেরো হেরেছেন কিন্তু প্রচুর ভোটও পেয়েছেন। মনে করা হয়েছিল লুলা প্রথম রাউন্ডেই জিতে যাবেন, কিন্তু বাস্তবে লুলার জেতা অত সহজে হয়নি। সংসদে বোলসোনেরোর সমর্থকরা রয়েছে। আমাদের দেশের মতোই ঐসব দেশেও শাসকশ্রেণীর মদতেই দক্ষিণপন্থীরা শক্তি বৃদ্ধি করছে।

কর্পোরেট মিডিয়া বিজেপির হয়ে প্রচার করছে। গুজরাটের নির্বাচনের পর বলা হল, আর কোনো বিকল্প নেই, এখান থেকে যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা ২০২৪ সালে বিজিপিকে আবার ক্ষমতায় নিয়ে আসবে। যদিও হিমাচল সহ কয়েকটি জায়গায় উপনির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হয়েছে, তাও এটা খুবই পরিষ্কার যে কর্পোরেটরা দক্ষিণপন্থীদের মদত দিচ্ছে। তারা সফলও হচ্ছে। ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্রে জাতিবিদ্বেষে মদত দেওয়া হচ্ছে। এখানে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি হিন্দুত্বের প্রচার করছে। তারা খুবই সফল। সমাজের যা কিছু ব্যাধি, বেকার সমস্যা বা অন্য কিছু, সব কিছুর জন্য সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের দায়ী করা হচ্ছে। সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপর অংশকে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেন এসবের কারণ নয়া উদারনীতি নয়, মুসলমান বা দলিতরাই এর কারণ! এবং কংগ্রেসকে দায়ী করা হচ্ছে কারণ কংগ্রেস নাকি এতদিন ধরে মুসলিমদের তোষণ করেছে! অথচ এই বক্তব্য একেবারেই ঠিক নয়। বেকারি সবচেয়ে বেশি মুসলিমদের মধ্যে, দারিদ্র, নিরক্ষরতাও তাদের মধ্যে খুবই বেশি। এটা একেবারেই নয় যে মুসলিমরাই এতদিন ধরে সব সুযোগ পেয়েছে। দলিতদের সম্পর্কেও একই কথা বলা হচ্ছে যেহেতু তাদের জন্য সংরক্ষণ আছে।

বিজেপি যাদের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই আর এস এস স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেনি এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা চেয়েছিল মনুস্মৃতিকে সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করা হোক, আম্বেদকর প্রণীত যে সংবিধান আজ রয়েছে তা তারা তখন মানেনি। এখন তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে চাইছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আরএসএস-র লোক ঢোকানো হয়েছে। সিবিআই, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় সর্বত্র আরএসএসের লোকেরা রয়েছে এবং তারা নির্দেশ দিচ্ছে এবং বিভাজন সৃষ্টি করছে। আমরা সবাই জানি ছোট ছোট বিভিন্ন জিনিসকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন উৎসবকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভাজন সৃষ্টির জন্যে, দাঙ্গা লাগানোর জন্য। কর্ণাটকে আমরা দেখেছি, অন্যান্য রাজ্যেও উভয় ধর্মের মধ্যে কখনও আজান, নামাজের স্থান, নিকটবর্তী মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি নানা ছুতোয় সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। অযোধ্যার পরে কাশী, এখন মথুরাকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গে-উপাঙ্গে এসব প্রবেশ করানো হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের প্রতিদিনের সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য এবং তাদের ঐক্য ভাঙার জন্য এটা করা হয়েছে।

সমস্ত নির্বাচনের আগে যখনই তারা সমালোচিত, নিন্দিত হচ্ছে, 'জাতীয়তাবাদ'-এর ধুয়ো তুলছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগেও তারা জাতীয়তাবাদের বিষয়টা এনেছিল এবং এইভাবেই তারা ক্ষমতায় এসেছে।

এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য তৈরি করা হচ্ছে কাদের সন্তুষ্ট করতে? কাদের লাভ এতে? এতে কর্পোরেটদের লাভ।এই সময়ে আমরা দেখেছি কিভাবে তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বেড়েছে। অন্য দেশেও

অসাম্য বাড়ছে। আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ধনীদের মধ্য উপরের দিকের ১০ শতাংশ এবং নিচের দিক থেকে অর্ধেকের আয়ের অনুপাত ১৯৬২ সালে ছিল ১৮ শতাংশ, বর্তমানে তা ৩৮ শতাংশ। পার্থক্যটা দ্বিগুণের বেশি। কোভিড পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা, ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থা সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে। সংকটের জন্য এখন আর উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শোষণ করেও যথেষ্ট লাভ হচ্ছে না, তাই তারা দেশের সম্পদ, সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা, লুঠ করা শুরু করেছে। এটার জন্য প্রথমেই তারা বেসরকারীকরণ করছে। সর্বত্র সরকারী সম্পত্তি, সরকারী পরিকাঠামো, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে দুর্বল করা হচ্ছে, বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের দেশেও সরকার নয়া উদারনীতির শুরু থেকেই বেসরকারীকরণ শুরু করেছে। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের জন্য, প্রতিরোধের জন্য তারা যত তাড়াতাড়ি করতে চেয়েছিল ততটা পারেনি। বিজেপি সরকারও বেসরকারীকরণের চেষ্টা করেছে। ২০১৯ সালে ক্ষমতায় এসে তাদের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র ঘোষণা করে—রেল সহ বিভিন্ন সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং শ্রম আইন পরিবর্তন। প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা সবটা করে উঠতে পারেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বেসরকারীকরণ করতে বাধা পেয়ে তারা এখন বিকল্প পথ গ্রহণ করেছে—ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন। এর মাধ্যমে সরকার চার বছরের মধ্য ৬ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে সরকারী পরিকাঠামো রয়েছে, যেগুলি সরকারী অর্থে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলিকে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবার জন্য এই পদক্ষেপ। দেশের জাতীয় সড়ক ব্যবস্থা, রেল পথ, রেলের গোডাউন, গুডস শেড, স্টেশন, রেলওয়ে স্টেডিয়াম, রেলওয়ে কলোনি, উৎপাদন কেন্দ্র—সবকিছুই কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রেলের উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ডিজেল লোকোমোটিভ, ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ সহ বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। চেন্নাইয়ের আইসিএফ (ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি) বন্দে ভারত ট্রেন তৈরি করেছে। কিন্তু তাদের অর্ডার না দিয়ে বেসরকারী কর্পোরেট, বহুজাতিক কর্পোরেটদের দেওয়া হচ্ছে। আজই খবরের কাগজে একটা সংবাদ বেরিয়েছে যে সরকার ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ উৎপাদন সিমেন্স কোম্পানির হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিএসএনএল টাওয়ার এবং অপটিকাল ফাইবার উৎপাদন তুলে দেওয়া হবে বেসরকারী কোম্পানির হাতে। জ্বালানি তেলের পাইপলাইন, বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থা—ট্রান্সমিশন বা পাওয়ার গ্রিড, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন সবই তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। জনগণের টাকায় তৈরি হওয়া পরিকাঠামো এইভাবে প্রায় বিনামূল্যে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং তারা এইগুলি ব্যবহার করে যে পরিষেবা দেবে সেটার জন্য আবার জনগণকে টাকা দিতে হবে। জাতীয় সড়ক যে বেসরকারী কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে তারা পণ্য পরিবহনের জন্য টোল তুলতে পারবে তাদের খুশি মতো। রেলওয়ে ট্র্যাক যাদের দেওয়া হবে তারা বেসরকারী ট্রেন চালানোর জন্য তাদের খুশি মতো ভাড়া নির্ধারণ করবে, কোনো ছাড় সেখানে পাওয়া যাবে না। ট্রেনের নির্ঘন্টও তারা ঠিক করবে। বেসরকারী ট্রেনের এক ঘন্টা আগে থেকে এক ঘন্টা পর পর্যন্ত কোনো সরকারী ট্রেন সেখানে চলবে না। বিএসএনএল-এরই তৈরি করা টাওয়ার ব্যবহার করার জন্য বিএসএনএলকে টাকা দিতে হব বেসরকারী সংস্থাকে। এই ভাবে সমস্ত রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ল্যান্ড মনিটাইজেশন কর্পোরেশন তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, কর্পোরেটদের হাতে ঐ জমি দেওয়া হবে রিয়েল এস্টেট তৈরি করার জন্য। এটা শুধু শ্রমিক বা সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী তাই-ই নয়, এটা দেশের স্বার্থেরও পরিপন্থী।

আমাদের দেশে আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন এবং আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম ৭৫ বছর আগে। এই উপলক্ষে সরকার 'আজাদিকা অমৃত মহোৎসব' পালন করছে, বলা হয়েছে পরবর্তী ২৫ বছর অর্থাৎ স্বাধীনতার শতবর্ষ পর্যন্ত 'অমৃতকাল' চলবে। দেখা যাচ্ছে এই পর্বেই আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনকালের মতো পরিস্থিতিতে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে— দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকবে বেসরকারী হাতে। দেখা যাচ্ছে এই পর্বেই আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনকালের মতো পরিস্থিতিতে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকবে বেসরকারী হাতে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য লড়াই করেছিলেন— যেখানে বেকারী থাকবে না, মানুষ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণ করতে পারবে। এইসমস্ত কিছুই মুছে দেওয়া হচ্ছে। শ্রম কোড এখনও চালু করা হয় নি। কিন্তু এটা চালু হলে শ্রমিকশ্রেণী তাদের সংগঠিত হবার অধিকার হারাবে,সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের অধিকার হারাবে, ধর্মঘট নিষিদ্ধ হবে, সমিতি-সংগঠন তৈরি করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। শ্রমিকদের ক্রীতদাসের জীবনে ঠেলে দেওয়া হবে। এগুলোই হচ্ছে নয়া উদারনীতির বিপদের দিক। এইগুলোই আজ শ্রমিক কর্মচারী সহ সকল মেহনতী মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ। কোভিডের জন্যই পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে এমনটা নয়, এর জন্য দায়ী কর্পোরেট স্বার্থে পরিচালিত নয়া উদারনীতি, যদিও এটা ঠিক যে কোভিড সত্যিই পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। বিজেপি একদিকে আক্রমণাত্মকভাবে নয়া উদারনীতি প্রয়োগ করছে কর্পোরেট স্বার্থে, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে বিভাজনের জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। তাদের পরাস্ত করা সম্ভব, কিন্তু তার জন্য আগে শ্রমিকদের মধ্যে, কর্মচারীদের মধ্যে এই দুধরণের নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রসার ঘটাতে হবে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কাদের স্বার্থে কাজ করছে? এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারও বিজেপির মতো একই নীতি অনুসরণ করছে। কোনো পার্থক্য নেই। তৃণমূলও নরম হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে চলছে, রাজনৈতিক স্বার্থে তারা বিজেপির সঙ্গে আপসও করছে। কিন্তু আজকের প্রধান বিপদ বিজেপি, কারণ তারা জাতীয় স্তরে সমস্ত বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমাদের গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, চ্যালেঞ্জ আছে, কিন্তু পরিস্থিতির মধ্য সম্ভাবনার দিকও আছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে অতিমারীর মধ্যেই শ্রম কোডের বিল পাশ হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার তা চালু করতে পারেনি। শ্রম কোডের অনুসারী রুলের খসড়া পর্যন্ত তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু চালু করতে পারেনি। শ্রমিক কর্মচারীদের ধারাবাহিক প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। কতগুলি আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের? কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে সরকার যখন ধর্মঘট, সভা-সমাবেশ, ধর্ণা, মিছিল সবকিছুতেই নিয়ন্ত্রণ জারি করল, তখনও ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর শ্রমিকশ্রেণী দেশজোড়া ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের আওতার বাইরে থাকা বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন, সংখ্যায় তারাই বেশি। নতুন নতুন ক্ষেত্র থেকে তারা অংশগ্রহণ করেছেন। একইভাবে এবছর ২৯-৩০ মার্চ আমরা আবার ব্যাপক ধর্মঘট করেছি। যদিও কিছু ক্ষেত্রে

● চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য

তফাত রয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, কিছু রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সন্তোষজনক নয়। সেগুলি আমাদের আত্মসমালোচনার সঙ্গে খতিয়ে দেখতে হবে এবং কাটিয়ে উঠতে হবে। কিন্তু প্রতিরোধ হয়েছে এটা স্বীকার করতে হবে।

শুধু কৃষকরাই নয়, বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিদ্যুৎ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎকর্মীরা বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন খুব শক্তিশালী নয় সেখানেও সরকার যখন বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ করতে গেল তখন বিদ্যুৎ দপ্তরের সমস্ত কর্মচারী- অফিসার-ইন্‌জিনিয়ার একসঙ্গে ধর্মঘট করে সরকারকে পিছু হটিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরেও ট্রেডইউনিয়নের শক্তি খুবই সীমিত, সেখানকার পরিস্থিতির কথাও আমরা সবাই জানি, সেই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিজেপি সরকার যখন বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ করতে গেছে তখন ধর্মঘট হয়েছে এবং একইভাবে সরকার পিছু হটেছে। পুদুচেরীতেও একই ঘটনা ঘটেছে। কর্মচারীরা লড়াই করেছে এবং সরকার পিছিয়ে গেছে। অর্থাৎ, যেখানেই শ্রমিক- কর্মচারীরা এগিয়ে এসে একজোট হয়ে আন্দোলন করেছে সেখানেই সরকার পশ্চাদপসরণ করেছে।

ব্যাঙ্ককর্মীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হয়েছে। সরকার দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে নির্দিষ্ট করে বেসরকারীকরণ করার জন্য, ক্যাবিনেটে তা অনুমোদিত হয়, এরপর বিলটি সংসদে পাশ করানোর জন্য আনার উদ্যোগ হয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা দুটি ধর্মঘট করেন। সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়, একই বছরের মধ্যে দুবার দুদিন ব্যাপী ধর্মঘট! ফলে সরকার আর সেই বিল পেশ করতে পারেনি। এখনও পর্যন্ত তা ঠেকিয়ে রাখা গেছে। বিদ্যুৎ বিল যেদিন সংসদে পেশ হয় সেদিন সারা দেশ জুড়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন এবং সরকার তাতে বাধ্য হয়ে বিলটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠায়। যদিও প্রথমে সরকারের অভিসন্ধি ছিল বিলটি সংসদে পেশ করে সেইদিনই পাশ করিয়ে নেওয়া। এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা কৃষকদের, এই অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের। যখনই আমরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি এবং লড়াই করছি তখনই সাফল্য আসছে।

সরকার ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্ট, সালেম ইত্যাদি বেসরকারীকরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্টের শ্রমিকরা এর বিরুদ্ধে ৭০০ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছিল এবং কোনো বেসরকারী লোকজনকে কারখানার দখল নিতে দেয়নি। রাজ্য সরকার প্রথমে বেসরকারীকরণের পক্ষে ছিল, কিন্তু জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভাইজাগ শ্রমিকরা যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাতে থাকে তখন সমস্ত রাজনৈতিক দল, এমনকি যারা নীতিগতভাবে বেসরকারীকরণের সমর্থক—টি ডি পি (তেলেগু দেশম পার্টি), কংগ্রেস, ওয়াই এস আর সি পি (যুবজন শ্রমিক রিথ্যু কংগ্রেস পার্টি) ইত্যাদি রাজনৈতিক দলও চাপে পড়ে ভাইজাগ স্টিল প্ল্যান্ট বেসরকারীকরণের বিরোধিতা শুরু করে এবং সরকার এখনও পর্যন্ত তা বেসরকারীকরণ করতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটেছে বি ই এম এল (ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেড)-এর ক্ষেত্রে। সরকার সংসদে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে যে তারা বি ই এম এল বেসরকারীকরণ করছে না। সেখানে আন্দোলন এখনও চলছে।

এরকম বহু বহু ক্ষেত্র উল্লেখ করা যায়। আমরা সবাই জানি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়ক, আশা কর্মীরা, কোভিডের সময়ে ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসাবে যাদের ঘোষণা করা হয়েছে, তারা কি বিপুল পরিষেবা জনগণকে দিয়েছে, তাদের নিয়মিত কাজের পরিধির বাইরে গিয়েও বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করা, রোগীদের চিহ্নিত করা, পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি কাজ তারা করেছে। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আশা কর্মীদের এই কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। কিন্তু তারা মজুরি পায় না, তাদের মজুরি বৃদ্ধিও হয় না। মাসের পর মাস মজুরি না পেয়ে তারা আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়। তাতে তারা আক্রমণের শিকার হয়। হরিয়ানার বিজেপি সরকার এক হাজারের বেশি আন্দোলনরত অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়কের কাজ কেড়ে নেয় কারণ সরকার তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণের দাবিতে আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছিল। দিল্লিতে ৯০০-র ওপর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়ককে কর্মচ্যুত করা হয়। এসব সত্ত্বেও তাদের একতায় চিড় ধরেনি, আক্রমণের বিরুদ্ধেও তারা লড়াই চালিয়ে গেছিলেন, দাবি আদায়েও তারা এককাট্টা ছিলেন। অবশেষে প্রায় সব ছাঁটাই হওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়ককে পুনর্বহাল করা হয়। এটা পরিষ্কার যে যেখানেই ঐক্যবদ্ধ এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম করা গেছে, সেখানেই সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আজকে এই সংগ্রামকে আরও তীব্র করা প্রয়োজন। ১৮ থেকে ২২ জানুয়ারি, ২০২৩-য়ে সি আই টি ইউ-এর সপ্তদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বেঙ্গালুরুতে। পূর্ববর্তী ষোড়শ সম্মেলনের আহ্বান ছিল—ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে প্রতিরোধ এবং মোকাবিলার স্তরে উন্নীত করো। শুধুমাত্র দাবি উত্থাপন, সরকারের কাছে আবেদন এবং আনুষ্ঠানিক ধরনের কর্মসূচী—ধর্না, কখনও সখনও ধর্মঘট, মিছিল ইত্যাদিই যথেষ্ট নয়, আমাদের সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এটাই ছিল সিআইটিইউ-র বোঝাপড়া। এর জন্য নয়া উদারনীতির বিপর্যয়কর ফলাফল সম্পর্কে এবং আর এস এস-এর বিষাক্ত, বিভাজনকারী, সাম্প্রদায়িক অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। উভয়ের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম দরকার। এটা এরকম নয় যে আগে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করি, পরে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটা দেখা যাবে, অথবা, আগে সবাই একসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইটা করা যাক, পরে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা হবে। দুটো লড়াই-ই একযোগে করতে হবে। কারণ এইসব নীতির প্রভাব শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে পড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে, কমরেডরা বলছিলেন, লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ পড়ে রয়েছে সরকারী দপ্তরগুলিতে। কর্মচারী সংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ/তিনগুণ শূন্যপদ। সরকার সেগুলি পূরণ করছে না। অথচ, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীরা রয়েছে, আউটসোর্সিং হচ্ছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশে, বিভিন্ন রাজ্যে একই পরিস্থিতি। স্থায়ী কর্মচারীরা অবসর নিলে স্থায়ী পদগুলি বিলোপ করা হচ্ছে। এটা নয়া উদারনৈতিক অ্যাজেন্ডার অংশ। আপনাদের মনে পড়বে, নয়া উদারনীতি আমাদের দেশে চালু হয় কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সময়ে, যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং, তখন এটি অন্যতম অ্যাজেন্ডা করা হয়েছিল যে পদের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। এর জন্য লক্ষ্যমাত্রাও দেওয়া হয়েছিল— প্রতিবছর ৫ শতাংশ করে পদ কমিয়ে আনা হবে। সেটা এখনও চলছে। তাই স্থায়ী পদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, আউটসোর্সিং, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক বাড়ছে। শিল্পক্ষেত্রে তাদের নানারকম নাম দেওয়া হচ্ছে— অ্যাপ্রেন্টিস, ট্রেনি, নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক কর্মচারী ইত্যাদি। এখন আমাদের রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং অন্যান্য সমস্ত মানুষকে সচেতন করতে হবে যে এগুলি হল নয়া উদারনীতির পরিণাম। আমাদের যে কোনো সমস্যা, ডিএ ফ্রিজ বা যেকোনো সুযোগসুবিধা খর্ব হওয়া, সবই নয়া উদারনীতির সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। আজকে শ্রমিক কর্মচারীরা নয়া উদারনীতির ফলাফলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। সিআইটিইউ মনে করে, এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নয়া উদারনীতির ফলাফলের বিরুদ্ধে লড়াইকে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে রূপান্তরিত করতে হবে। এর জন্য মেহনতী মানুষের বৃহত্তর ঐক্য প্রয়োজন। আজকে ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ, প্রধান শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের ফেডারেশনগুলি যুক্ত মঞ্চে সমবেত হচ্ছে— সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কনফেডারেশন, বিএসএনএল, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি সকলে সেখানে রয়েছে। কিন্তু একে শক্তিশালী করতে হবে। শীর্ষ নেতৃত্বের স্তরের ঐক্যকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে— দপ্তরে দপ্তরে, কলে-কারখানায়, শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছতে হবে। একমাত্র নয়া উদারনীতি সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব। কারণ নিচের স্তরে মতভেদ থাকতে পারে, ট্রেডইউনিয়নগুলির মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে, বিভিন্ন মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, শ্রমিকদের সমস্যাগুলি সবার ক্ষেত্রেই এক। শ্রমিকের সমস্যার সঙ্গে সরকারী নীতির যোগ কোথায়, যে রাজনীতি এই নীতিগুলি নির্ধারণ করে সেটাই বা কি— এইসব প্রশ্নে আমাদের সংগঠনগুলির—সি আই টি ইউ, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন এবং তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলি প্রভৃতির মধ্যে একটি সাধারণ বোঝাপড়া রয়েছে। আমরা যদি ধৈর্য ধরে এই বোঝাপড়াকে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যেতে পারি তাহলে ঐক্যকে শক্তিশালী করার ভিত্তিটা তৈরি করা যায়। এর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবিদের সমস্ত অংশের মধ্যে ঐক্যকে শক্তিশালী করার কাজটাও জরুরী। আমরা দেখেছি কিভাবে কৃষকরা লড়াই করেছে এবং শ্রমিকরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেখানেও ঐক্য হয়েছিল জাতীয় স্তরে, নিচের স্তরে সেটা নামেনি। সিআইটিইউ তৃণমূল স্তরে বিভিন্ন সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সমন্বয় কমিটিগুলির মাধ্যমে কৃষক, কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। জনগণের সাধারণ দাবিদাওয়া, যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মহীনতা, খাদ্য সুরক্ষা ইত্যাদি সব সমস্যা তৃণমূল স্তরে একজন কৃষক বা একজন শ্রমিক বা কৃষি শ্রমিক যেগুলির মুখোমুখি হন সেগুলি সবই নয়া উদারনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং সেই নীতিগুলিকে কার্যকর করছে সরকার।

আমরা যদি এই সময়পর্বে আমাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগাতে পারি তাহলে কৃষক-শ্রমিক-কৃষি শ্রমিকদের ঐক্যকে নিচের স্তর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যেহেতু বিভিন্ন অংশের মানুষকে পরিষেবা দেন সেজন্য আপনাদের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। আপনারা তাদের কাছে সরকারী কর্মচারীরা কি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন সেকথা বুঝিয়ে বলতে পারেন, পরিষেবাপ্রদানের সূত্রে সহায়তা করে তাদের মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। আপনারা, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা এবং শিক্ষকরা কিভাবে বিভিন্ন অংশের মানুষকে সংগঠিত করার কাজে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা প্রতিপালন করেছেন সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। যেমন ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা থাকে ইত্যাদি। বর্তমানে আপনারা যদি সেই সকল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান তাহলে সমস্ত অংশের শ্রমজীবি মানুষকে একসঙ্গে আনার কাজে সাহায্য হবে এবং এতে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো তীব্র করা যাবে। এটাই সিআইটিইউ-র "ঐক্যকে জোরদার করে সংগ্রামকে প্রতিরোধ ও মোকাবিলার স্তরে উন্নীত করা"-র আহ্বানের অন্তর্বস্তু।

আন্তর্জাতিক স্তরের অভিজ্ঞতাও বলছে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ে বিকল্প দৃষ্টিকোণ হাজির করা গেছে সেখানে প্রবল দক্ষিণপন্থী শাসকরা পর্যন্ত পরাস্ত হয়েছে। আমাদের কাছে লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা আছে। চিলিতে সংগ্রাম প্রথমে শুরু হয় পরিবহণ ভাড়া বাড়ার বিরুদ্ধে, ছাত্রদের হাত ধরে তা শুরু হয়। সেই লড়াই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে, মহিলারা,শ্রমিকরা ও অন্যান্য অংশের মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন, এবং লড়াইটা হয়ে ওঠে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে লড়াই, এরপর পিনোচেতের সময়ের সংবিধান পরিবর্তন করে নতুন সংবিধানের দাবি করা হয়। শেষপর্যন্ত তারা সরকার তৈরি করেন যেখানে কমিউনিস্ট সহ বামপন্থী দলগুলি রয়েছে। পেরুতে দক্ষিণপন্থীদের চাপে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার বদল ঘটাতে বাধ্য হয়েছেন। সম্প্রতি তাকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা সেখানে তাম্রখনিগুলি সহ অন্যান্য খনিগুলিকে কর্পোরেটদের হাতে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ, এটা খুব সহজ কাজ নয়,কিন্তু সঠিকভাবে করা গেলে সফলতা সম্ভব।

আমাদের দেশেও সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিকল্প নীতির দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার, শুধু মোদীকে সমালোচনা করে কিছু হবে না। মোদী বৃহৎ কর্পোরেটদের প্রতিনিধি, যে নীতিগুলি মোদী কার্যকর করছেন তাতে তারা লাভবান হচ্ছে। তারা মোদীকে এবং বিজেপিকে সমর্থন করছে কারণ বিজেপির বাড়তি একটা দিক আছে। কংগ্রেসের তুলনায় ফ্যাসিস্টধর্মী বিজেপি সমস্ত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বলপ্রয়োগে অবদমিত করায় বেশি পারঙ্গম। কাল যদি তারা দেখে মোদীকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তারা পরিবর্তন করে দেবে। আমাদের নীতির বিরুদ্ধে, এবং সেই নীতির পিছনে যে রাজনীতি আছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। আমরা যদি আমাদের অনুগামীদের মধ্যে, সদস্যদের মধ্যে এবং সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা আজকে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারব । কারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে সেই সচেতনতা আপনারা গড়ে তুলবেন এবং রাজ্যসরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবেন। □ (সমাপ্ত)

অনুলিখন ঃ শাশ্বতী মজুমদাব

কমরেড শম্ভু চক্রবর্তীর জীবনাবসান

সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদী প্রবীণ নেতা কমরেড শম্ভু চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৭৯। শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে গত ১৯শে মে রায়গঞ্জে এক বেসরকারী নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি হন, শনিবার (3/6/23) মৃত্যু হয় তাঁর। রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতির (W.B.M.O.A) প্রাক্তন নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাঁচ বারের জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি বাসস্থান হুগলীর শ্রীরামপুর, রিষড়ায় পৈত্রিক বাড়ি তার। ১৯৭৮ সালে যুব কল্যাণ দপ্তরে করণিক পদে বর্ধমান জেলায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি পশ্চিম দিনাজপুরে বদলী হয়ে যান। তিনি চাকুরিতে যোগদানের শুরুর দিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A)-র সদস্য ছিলেন। তিনি সমিতির (W.B.M.O.A) কর্মী থেকে নেতৃত্ব ও সংগঠকে পরিণত হন। সরকারী কর্মচারী সংগঠনের নেতা শুধু নয় তিনি অবিভক্ত দিনাজপুরের বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। কর্মচারী হিসাবে একজন উচ্চবর্গীয় করণিক থেকে বিভাগীয় আধিকারিক পদে উন্নীত হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলায়।

তিনি ছাত্র-যুব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারী কর্মচারী হওয়ার সুবাদে কর্মজীবনে তিনি কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গেই নিজেকে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত রেখেও বিভিন্ন গণআন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অবিভক্ত দিনাজপুরের প্রধান সংগঠক। পরবর্তীকালে উত্তর দিনাজপুরের শুধু কর্মচারী সমাজের সাথে যুক্ত না থেকে সমস্ত শ্রেণীর বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মেহনতী মানুষের স্বার্থে কাজ ও আন্দোলন করে গেছেন। সাক্ষরতা আন্দোলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজেও তিনিই ছিলেন দীর্ঘদিন প্রধান সংগঠক উত্তর দিনাজপুর জেলায়। তিনি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতিরও প্রধান সংগঠক ছিলেন। সাংস্কৃতিক জগতেও তিনি ছিলেন একজন প্রাণপুরুষ। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেকে জেলার বিভিন্ন স্কুলের পিছিয়ে পড়া মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের টেষ্ট পেপার বিতরণ, সবেতেই তিনি সমান গতিশীল ছিলেন। করোনার সময়কাল থেকেই নিজে অসুস্থ থেকেও চেষ্টা করেছেন আক্রান্ত মানুষ, লকডাউনে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে থাকার।

কমরেড চক্রবর্তীরা ছিলেন চার ভাই ও দুই বোন। গত ২০০৬ সালে স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। বর্তমানে পরিবারে দুই পুত্র।

উল্লেখ্য কমরেড শম্ভু চক্রবর্তী অবসরের পর উত্তর দিনাজপুর জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথেও নিজেকে যুক্ত করে নিষ্ঠা সহকারে সমাজের জন্য নিয়মিত কাজ করে গেছেন।

আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী কমরেড চক্রবর্তী'র শনিবার (3/6/23) রায়গঞ্জ শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব। বিগত ১৬ জুলাই ২০২৩ রায়গঞ্জের ছন্দম প্রেক্ষাগৃহে কমরেড শম্ভু চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ লিটন কুমার পান্ডে, কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব তথা প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী ও প্রদীপ নাগ সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার কর্মী নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, মানস দাস ও প্রবীর মুখার্জী। □

সুকান্ত চৌধুরী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩

কুমকুম মিত্র

এখানের আলোচ্য বিষয়টি আমাদের সকলেরই খুবই পরিচিত এবং আমরা ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছি বিষয়টির সাথে। আমাদের সকলের একমাত্র ও প্রিয় যে বাড়িটি, যেখানে আমরা সকলে আজন্মকালন ধরে থাকি, সেই পৃথিবী নামক বাড়িটি যখন আমাদেরই অসচেতনতার জন্য ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দুর্বিষহ হয়ে উঠছে তখন সত্যিই খুব কষ্ট হয়। পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব বা তাৎপর্য আমাদের কাছে কতটা সেটাই ভাবার বিষয়।

একটি শিশু বা যে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে বা তারা একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে এবং সেই পরিবেশের সঙ্গেই সে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টা করে, সেটা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের পরিবেশ হতেই পারে। যেমন শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ প্রধান দেশের মানুষ-প্রাণীরা স্ব-স্ব পরিবেশেই নিজেকে তৈরি করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই পরিবেশের আমুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যার ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে, বিভিন্ন রকম দূষণের ফলে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, এর ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটছে তার জন্য মানুষ বা প্রাণীজগৎ সুস্থভাবে আর বাঁচতে পারছে না। কিন্তু একটি সুস্থ পরিবেশ পাওয়া প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। এই পরিবর্তন শুধু হঠাৎ করে হয়নি, বহু বছর আগে থেকেই ঘটে চলেছে। ১৮ শতকের গোড়া থেকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় শিল্প বিপ্লব। তখন থেকেই ধীরে ধীর পরিবেশ দূষণ শুরু হয়ে যায়। ১৭৬০ সাল থেকেই ১৯৭২ সাল দুই শতাব্দীর এই দীর্ঘ সময়ে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছিল পরিবেশের। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ যত এগিয়ে গেছে, পাশাপাশি ততোধিক নিজেদের বিপদও ডেকে এনেছে।

১৯৬৮ সালের ২০ মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে সুইডেন সরকার গভীর উদ্বেগের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণের বিষয় নিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। সেই বছরই জাতি সংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সমাধানের উপায় খুঁজতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মতিতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ থেকে ১৬ জুন টানা ১২ দিন জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১১৯টি দেশের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনটি ইতিহাসে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭২ সালে সম্মেলনের প্রথম দিন ৫ জুনকে জাতিসংঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে প্রতি বছরই এই দিনটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকমতো বজায় রেখে মানুষের যাতে এই পৃথিবীর বুকে অন্যান্য সমস্ত জীবের সাথে একাত্ম হয়ে এক সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতি বছরই এই দিনটি আলাদা আলাদা শহরে বিভিন্ন প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে প্রতিপালিত হয়। ২০২৩ সালে প্লাস্টিক দূষণ বন্ধের আহ্বানে "প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে শামিল হই সকলে" এই স্লোগানে সারা বিশ্বে এই দিনটি পালিত হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে।

পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ নীতিতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন শুরু করার নিরিখেই এই দিনের তাৎপর্য অপরিসীম। এই রূপান্তরমূলক পরিবর্তন শুধুমাত্র কোনো একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কার্যকরী পরিবর্তনের জন্য সমস্ত সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও সরকারের মধ্যে পূর্ণ সহযোগীতা অত্যাবশ্যক। পরিবেশগত সমস্যা ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, সাংস্কৃতি কর্মসূচী ও সচেতনতা প্রচারের মধ্যে দিয়ে সবাইকে শিক্ষিত করা ও সচেতন করা একান্ত জরুরি বিষয়। বর্তমান

বছরের এই দিনটির যে স্লোগান—প্লাস্টিকের দূষণের সমাধান, বিশ্বজুড়ে এই পরিবেশ দূষণকারী উপাদানটির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। সেটিকে নিয়েই নতুন করে ভাবনা-চিন্তার উদ্যোগ নেওয়ার আর্জি জাতিসংঘের। প্লাস্টিক এমন একটি উপাদান যা নানাভাবে পরিবেশ দূষণ হয়। যেখানে সেখানে ফেললে মাটি ও জল দূষণ হয়, কারণ কাগজের মতো এটা মাটিতে মিশে যায় না, ফলে মাটির সাধারণ গুণাগুনও নষ্ট হয়। এমনকি জলে—নদী, নালা, খাল, বিল বা সমুদ্রেও প্লাস্টিক পড়ে জলজ প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। তাই দিন দিন বাড়তে থাকা এই প্লাস্টিক নামক বর্জটি নিয়ে ভাবনার আরো গভীরে যাওয়া উচিত। আধুনিকভাবে কোন কোন পদ্ধতিতে এই বর্জ পদার্থ সঠিকভাবে নষ্ট করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা চলছে বৈজ্ঞানিক মহলে। 'উন্নয়ন' বা 'পরিবেশ' কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও আলোচনা চলছে। আগে হয়তো এতটা বেশি কেউ ভাবতো না, কিন্তু বিগত দুই বছর ধরে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' ঘটে চলেছে, তাতে পরিবেশই মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা যা করছ তা ঠিক করছ না এবং এর ফলেই এত দুর্ভোগ হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে প্লাস্টিক দূষণের ভয়াবহতা সকলের কাছে তুলে ধরা একান্ত জরুরি বিষয়।

শুধুমাত্র এই একটি দিনে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সরকারী বা বেসরকারিভাবে একটি গাছ লাগিয়ে ছবি তুলে মোবাইলে আপলোড করে নিজেদের গর্বিত করি। আর সারা বছর ধরে মুনাফার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে সেখানে ফ্ল্যাট কালচার গড়ে তুলছি পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করে। তৈরি হচ্ছে না কোনো সঠিক নিকাশী ব্যবস্থা যা আছে তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং বেড়ে চলা প্লাস্টিকের বর্জ জমে থেকে নানারকমভাবে প্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে। প্রকৃত পরিবেশকে প্লাস্টিকের হাত থেকে বাঁচাতে সরকার পক্ষ (কেন্দ্র-রাজ্য উভয়) মাঝে মাঝে লঘু পদক্ষেপ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও কখনোই কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পাশাপাশি আমরাও প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না বা চাইছি না। একটু ভেবে দেখুন, এখনো আমরা বাজারে গিয়ে কোনো জিনিস কিনলে নিজেরাই দোকানদারদের কাছে দাবি করি—দাদা / দিদি একটা ক্যারিব্যাগ দেবেন? বা আমার সামনে অন্য কেউ চাইলেও আমি প্রতিবাদ করি না। সুতরাং আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আত্মসচেতনতাই পারবে সার্বিকভাবে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং তবেই ২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান স্বার্থক হবে।

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, সমাজের ও জনগণের একটা অংশ হিসাবে আমরা সরকারী কর্মচারী তথা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বাস্তব সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই জনগণের দিকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তেমনই জীবনদানে 'রক্তদান'-এর মতো কর্মসূচীও প্রতিপালন করে আর্ত মানুষের পাশে থাকে, আবার কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া, বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়েও প্রতিনিয়ত লড়াই আন্দোলন করে থাকে, কারণ কর্মচারী ও তার পরিবারও জনগণের এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিগত ভাবে বিভিন্ন জেলায়, মহকুমায় এমনকি ব্লকস্তর পর্যন্ত বিশ্ব পরিবেশ দিবস বিভিন্নভাবে প্রতিপালন করেছে। বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী তো হয়েছেই, পাশাপাশি পরিস্থিতি ও বাস্তবতা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গা বিশেষত হাসপাতাল চত্বর, কোনো বড় অফিস চত্বর ইত্যাদি জায়গায় সাফাই কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে এ বছরের মূল থিম প্লাস্টিক দূষণ রোধের কর্মসূচী প্রতিপালন করেছে। তবে এখানেই শেষ নয় প্লাস্টিক বর্জন ও দূষণের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজের ধারাবাহিকতা চলবে। □

বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণকে গ্রেপ্তারের দাবি

অবশেষে বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে পদকজয়ী কুস্তিগিরদের টানা আন্দোলনের চাপে দাবি মানার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথমে তাঁদের চাপের কাছে নত হয়ে বৈঠকে বসতে বাধ্য হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বৈঠকের পাঁচদিনের মধ্যেই ফের আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের সাথে মুখোমুখি বসে সমস্যা মেটানোর উদ্যোগ নিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তিনি সরকারের তরফে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যৌন হয়রানিতে অভিযুক্ত কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রীজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে চার্জশিট দেবে দিল্লী পুলিশ এবং আন্দোলনে অংশ নেওয়া ক্রীড়াবিদ এবং শিক্ষাবিদদের বিরুদ্ধে যাবতীয় মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় সরকারের তরফে। যদিও বৈঠকের পর আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের তরফে সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুনিয়া স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন, "আন্দোলন প্রত্যাহৃত হচ্ছে না। সরকার সময় চেয়েছে, তাই আমরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব। ১৫ জুনের মধ্যে সরকার কথা না রাখলে ফের আন্দোলন শুরু হবে।"

"যদি আমাদের মারতে চান, তো মেরে ফেলুন। মরার জন্য তৈরি আছি। প্রাণ দিয়ে হলেও ন্যায়বিচার আদায় করবোই।" ৪ মে মধ্যরাত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা কুস্তিগির বীনেশ ফোগত যখন সাংবাদিকদের কথাগুলো বলছেন, তাঁর চোখে জল, কণ্ঠ ধরে আসছে। কিছুক্ষণ আগেই যন্তরমন্তরের সামনে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লী পুলিশের হাতে হেনস্থা হয়েছেন গত ২৩ এপ্রিল থেকে ধর্ণায় বসে থাকা দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদকপ্রাপ্ত দেশের প্রথম সারির কুস্তিগিররা, যাঁদের মধ্যে কেউ খেলরত্ন প্রাপক, কেউ বা পদ্মশ্রী, কেউ বা পদ্মভূষণ।

২৩ এপ্রিল থেকে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ধর্না শুরু হয়েছে দিল্লীর যন্তরমন্তরে তার সূত্রপাত কিন্তু গত ১৮ জানুয়ারি যেদিন বীনেশ ফোগত, দীপক পুনিয়া, রবি ধাইয়া, বজরং পুনিয়া এবং সাক্ষী মালিক—এই পাঁচ আন্তর্জাতিক কুস্তিগির ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রীজভূষণ শরণ

পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগীরদের ওপর রাষ্ট্রের দমন-পীড়ন

সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন, ভীতিপ্রদর্শন এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে ধর্নায় বসেন। বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণ সিং-এর বিরুদ্ধে নাবালিকা সহ সাতজন মহিলা কুস্তিগির দিল্লীর কনৌট প্লেস থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগে বর্নিত ঘটনাগুলোর সময়কাল ২০১২ থেকে ২০২২। এরপর তিন মাসের লাগাতার লড়াইয়ের পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ২৮ এপ্রিল দুটি এফ আই আর দায়ের করেছে ব্রীজভূষণের বিরুদ্ধে। প্রথমটি Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 এবং দ্বিতীয়টি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায়।

কে এই ব্রীজভূষণ শরণ সিং? ইনি উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত ছ'বারের সাংসদ এবং ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের তিনবারের প্রেসিডেন্ট। এর বিরুদ্ধে ৩৮টি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা চলছে, যার মধ্যে হত্যা ও হত্যার চেষ্টা, চোরাচালান, বাবরি ধ্বংস সংক্রান্ত মামলা এবং দাউদ ইব্রাহিমের মতো কুখ্যাত গ্যাংস্টারকে সাহায্য করার জন্য টাডা কেসও আছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেননি, আগামীতেও খুলবেন বলে মনে হয় না। অথচ এই প্রধানমন্ত্রীই অলিম্পিক, কমনওয়েলথ গেমস কিংবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে পদক জিতে আসার পর এই কুস্তিগিরদের চা-চক্রে আমন্ত্রণ করে টিভি ক্যামেরার সামনে অনেক কথা বলেন, তাঁদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান। ভিনেশ ফোগতকে তিনি নিজের পরিবারের মেয়ে বলে সম্বোধন করেন। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ক্যাম্পেইনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার সাক্ষী মালিক। কিন্তু আজ যখন দেশের বেটিরা সুবিচার পাবার আশায় নিজেদের পরিবার ছেড়ে রাস্তায়, যখন যন্তরমন্তরের সামনে ধর্ণাস্থলে প্রশাসনের নির্দেশে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, মহিলা কুস্তিগিররা মদ্যপ পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন, শ্লীলতাহানির শিকার হন, সে প্রসঙ্গ তাঁর 'মন কি বাত'-এ স্থান পায় না। আন্দোলনরত কুস্তিগিররা তাই বলছেন, "আমাদের মন কি বাত শুনতে চান না প্রধানমন্ত্রী"। গত ২৮ মে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রধানমন্ত্রীর সাধের নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা পুলিশের হাতে চরম লাঞ্ছিত হতে হয় দেশের পদকজয়ী বেটিদের। প্রতিবাদে তাঁরা তাঁদের পদক গঙ্গায় বিসর্জনের মতো সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। পরে সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন। কিন্তু আন্দোলন জারি থাকে।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার যতই এঁদের দাবি উপেক্ষা করুন, বা দমনপীড়নের মাধ্যমে ভয় দেখানোর পথ নিয়ে থাকুক, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মতো এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সরকারের কৌশল শুধু ব্যর্থই হয়নি বরং প্রতিদিন দেশবাসীর বর্ধিত সমর্থন পেয়েছে কুস্তিগিরদের এই আন্দোলন। তাঁদের দাবির সমর্থনে পথে নেমেছেন ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব। তাঁদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতের গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠন। আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়িয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পুলিশি হেনস্থার সম্মুখীন হন এসএফআই সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব, তাঁদের আটক পর্যন্ত করা হয়। তাঁদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে দোষী সাংসদের গ্রেপ্তারির দাবিতে দেশজুড়ে সরব হন একাধিক গণসংগঠন এবং মানবাধিকার সংগঠন। গ্রেপ্তার করা হয় পি কে শ্রীমতি, মারিয়ম ধাওয়ালে সহ নেতৃত্বদের। আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন এবং ফেডারেশন। আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অলিম্পিক পদকজয়ী অ্যাথলিট নীরজ চোপরা, ফুটবলার সুনীল ছেত্রী, দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ সহ দেশের একাধিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। পাশে দাঁড়িয়েছেন ১৯৮৩ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যরাও। পাশে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষা, শিল্প সহ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের খ্যাতনামা মানুষেরা।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের তরফ থেকেও কুস্তিগিরদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় রাজধানীর বুকে। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এবং দোষী সাংসদের গ্রেপ্তারীর দাবিতে ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে কলকাতা এবং জেলায় মিছিল ও বিক্ষোভ সভা করা হয়। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে টিফিন বিরতিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে পালন করা হয় বিক্ষোভ কর্মসূচী। গত ২ জুন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এবং ফেডারেশনের ডাকে কলকাতার বুকে কুস্তিগিরদের দাবির সমর্থনে এবং ব্রীজভূষণের শাস্তির দাবিতে মিছিল সংগঠিত হয়, সেখানে ১২ই জুলাই কমিটিও উপস্থিত ছিল। □

দীপংকর বাগচী

মণিপুর জ্বলছে

বিদ্যুত দাস

গত ৩ মে, ২০২৩ থেকে জাতিগত দাঙ্গায় মণিপুর জ্বলছে। সারা রাজ্যে কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি দাঙ্গায় দুশোর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক লক্ষ লোক ঘরছাড়া। ২৫০-র বেশি চার্চ পুড়ে গেছে, পাশাপাশি পুড়েছে বহু মানুষ। গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। পাঁচ হাজারের কাছাকাছি বাড়ি এবং দুশোর বেশি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে দাঙ্গায়। শরণার্থী শিবিরে অনেকে রাত কাটাচ্ছেন। বহু মানুষ পাশের রাজ্যগুলিতে এমনকি পাশের দেশ মায়ানমারে আশ্রয় নিয়েছেন। পাশবিক লালসার শিকার হয়েছেন পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের নারীরা। জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামী চুরাচাঁদ সিং-র স্ত্রী এস ইবেটম্বিকে (৮০)। গত ৪ মে ইম্ফলের কাপকপি জেলার একটি গ্রামে কুঁকি জনগোষ্ঠীর দুই মহিলাকে প্রায় হাজার খানেক মেইতেই যুবক নগ্ন করে হাঁটানোর পরে দল বেঁধে ধর্ষণ করে। গত ১৯ জুলাই এই ঘটনার ভিডিও ফাঁস করে রাজ্যের আদিবাসীদের সংগঠন "ইন্ডিজেনিয়াস ট্রাইবেল লিডার ফোরাম"। ডবল ইঞ্জিনের সরকারের ব্যর্থতায় এবং প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তার জেরে মণিপুর জাতিদাঙ্গায় জ্বলছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় নানা কারণে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। জাতিগত বিরোধের পাশাপাশি বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা সক্রিয়। প্রায় ৩৫ লক্ষ জনবসতির রাজ্য মণিপুর। ভৌগোলিক আয়তন ২২,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। মণিপুরে তিনটি প্রধান জাতিগত গোষ্ঠী আছে। মেইতেই (৫৩ শতাংশ), নাগা (২৪ শতাংশ) এবং কুকি (১৬ শতাংশ)। নাগা ও কুকিরা বেশিরভাগ পাহাড়বাসী। অন্যরা সমতলে বাস করেন। মণিপুর ফুটবল অন্তপ্রাণ। ভারতীয় ফুটবল দলে এবং কলকাতায় মণিপুরী ফুটবলাররা সুনামের সাথে খেলছে। একই সঙ্গে দেশে বিদেশে মণিপুরের ক্রীড়াবিদ, মীরাবাঈ চানু, মেরি কম, ডিংকো সিংহরা সুনাম অর্জন করেছেন।

মণিপুরের বিপ্লবী হিজাম ইরাবত সিংহ যিনি মণিপুরের সমস্ত স্তরের জনজাতিকে এক করার কথা বলেছিলেন। মণিপুরী নারীরা বারে বারে গর্জে উঠেছিলেন। ১৯০৪ এবং ১৯৩৯ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন মণিপুরের নারীরা। স্বাধীন ভারতেও বিভিন্ন অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন মণিপুরের মা-বোনেরা।

মণিপুরে জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য অতীতে কী কোনো বিরোধী বা সংঘর্ষ হয়নি? একাধিকবার হয়েছে। মণিপুরে মেইতেই, কুকি, নাগা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অতীতে বিবাদ, সংঘর্ষ হয়েছে। আবার বিরোধ মিটেও গেছে। কিন্তু ডবল ইঞ্জিনের সরকার বর্তমান বিরোধকে প্রশমিত না করে ধর্মীয় প্ররোচনা ছড়িয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী কুকিদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মেইতেইদের প্ররোচিত করছে। মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের মোদি সরকার উদ্বাস্তুর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করল এবং অবৈধ অভিবাসী ঘোষণা করল। শরণার্থী সমস্যাকেও কুকিদের বিরুদ্ধে মণিপুরের বাকি মানুষকে ক্ষিপ্ত করার কাজে ব্যবহার করল বিজেপি। একই সঙ্গে মণিপুর সরকার বনাঞ্চল থেকে কুকিদের উচ্ছেদ করতে শুরু করল কোনো পুনর্বাসন ছাড়াই। এর ফলে বহু কুকি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুকিদের অবৈধ আফিমচাষী বলে দেগে দিল শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া হচ্ছে, কুকিদের বহিরাগত, জমি দখলকারী, ড্রাগ মাফিয়া, মায়ানমারের অনুপ্রবেশকারী বলছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।

বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে যে গত ২৭ মার্চ, ২০২৩ মণিপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম ভি মুরলিধরন এক মামলার রায়ে মেইতেইদের উপজাতিভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের কাছে ৪ মাসের মধ্যে আবেদন করতে নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার বিধানসভায় বিল আনতে উদ্যোগ নেয়। মেইতেই সম্প্রদায় রাজ্যের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং ১৯৯১ সাল থেকে তারা অনগ্রসর জাতিভুক্ত। এই সংরক্ষণের প্রস্তাবে পার্বত্য অঞ্চলের নাগা ও কুকি সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ও মেইতেই সম্প্রদায়ের উপর ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। গত ৩ মে ২০২৩ সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হয়। একই সঙ্গে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা, কর্মহীনতা, আর্থিক বঞ্চনা, অত্যাচার, বিভেদের রাজনীতির কারণে জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। এইভাবে সাম্প্রদায়িক বিজেপি মণিপুরে বিভাজনের রাজনীতি বজায় রেখেছে। এই জাতিদাঙ্গা জিইয়ে রাখার পিছনে আরো একটি উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায়। জানা গেছে মণিপুরে পাহাড়ি এলাকায় নিকেল, তামা, প্লাটিনাম সহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের বিপুল ভাণ্ডার আছে, যেখানে কুকিরা বাস করে। রাজ্য সরকারের নতুন ফরমানে পাহাড়ে জমি কেনার অধিকার পাবে মেইতেইরা এবং সুবিধা পাবে বৃহৎ মাইনিং কর্পোরেশনগুলো। এভাবেই লুটের মৃগয়া ক্ষেত্র রূপে গড়ে তোলা হচ্ছে মণিপুরকে।

দীর্ঘ প্রায় তিন মাস মণিপুরে জাতি সংঘর্ষ প্রসঙ্গে দেশে বিদেশ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নীরব রয়েছেন। গোদি মিডিয়া প্রচার করে তিনি নাকি বিশ্বগুরু। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিরতির জন্য মধ্যস্থতা করেন। অথচ ভারতের ছোট্ট একটি রাজ্যের মৃত্যু মিছিল রোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির জন্য দেশবাসীকে বিক্ষোভ করতে হয়েছে। অবশেষে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের তিরস্কারে এবং নারী নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়াতে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যদিও সংসদে বিবৃতি দিতে প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে যাচ্ছেন। বিরোধীরা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে। এবং কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ করেছেন। দেশের প্রাক্তন সেনা প্রধান নিশিকান্ত সিং ট্যুইটে মণিপুরের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত লিবিয়া, লেবানন, নাইজেরিয়া ও সিরিয়ার তুলনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন মণিপুরবাসী এখন 'রাষ্ট্রহীন'। বিজেপির কুকি বিধায়ক পাওলিয়েনলাল হাওকিপ মণিপুরের সংঘর্ষের জন্য রাজ্যসরকারকে দায়ী করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ট্যুইটারে মন্তব্য করেন, "আমি আর সংসদের কাজে ফিরতে পারব না, তবে চায়ের দোকান দিতে পারব।" তিনি আরো অভিযোগ করেন, এই সরকার প্রতিবন্ধী মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে ৮০ দিন ধরে একটি জনজাতিকে নিকেশ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মণিপুরের ঘটনার নিন্দা করেছে। মণিপুরের মতো আমাদের রাজ্যেও জাতি সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের ভোটের রাজনীতির কারণে জঙ্গলমহলে আদিবাসী ও কুড়মিদের একের বিরুদ্ধে অন্যকে উস্কে দিচ্ছে। ২০১৭ সালে মণিপুরে বিজেপি সরকার গঠনে আস্থা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করেছে একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক টি. রবীন্দ্র সিং। এর মধ্যে দিয়ে তৃণমূল-বিজেপির সখ্যতা সামনে আসে।

মণিপুরের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে যেমন দেশের প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ নীরবতা পালন করেছেন, একইভাবে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও তাই করেছেন। সম্প্রতি মালদার বামনগোলা পাকুয়াহাটে মহিলাদের বিবস্ত্র করে বেধড়ক পেটানোর কুৎসিৎ ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। দোষীদের শাস্তির বদলে নির্যাতিতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হিংসাকে ও নারীর সম্ভ্রম লুটের অধিকার দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ে রাজ্যে নারীদের সম্মান লুটের আরো ঘটনা ঘটেছে। যেমন কোচবিহারে পুণ্ডিবারিতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ১৪ বছরের স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে। মুর্শিদাবাদে বড়ঞা থানার তলডুমা গ্রামে শাসকদলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যাকে বিবস্ত্র করে লাঠি, বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে। আক্রমণকারীরা শাসক দলের, তাই থানা অভিযোগ নিতে চায়নি।

আমাদের রাজ্যের স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদল এবং কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক, কর্পোরেটপ্রেমী শাসকদল রাজনৈতিক স্বার্থে বিভাজনের রাজনীতিকে ব্যবহার করে শ্রমজীবীদের ঐক্য দুর্বল করতে চাইছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুত্ববাদী চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রাখতে লড়াইতে সামিল হয়েছেন দেশের অগণিত মেহনতী মানুষ, বামপন্থীরা। আমাদেরও এই লড়াইতে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। □

মণিপুরে মহিলাদের উপর ভয়াবহ বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে সারা রাজ্যে প্রতিবাদ ধ্বনীত হয়। ২৫ জুলাই কলকাতায় কর্মচারী ভবন থেকে মিছিল করে মৌলালির মোরে জমায়েত হয়। সংক্ষিপ্ত সভার পর মৌলালির মোর অবরোধ করা হয়।

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসে গণতন্ত্র রক্ষার শপথ

রাজ্যে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমগ্র পর্বে শাসকদল, প্রশাসন কর্তৃক যৌথভাবে গণতন্ত্র হত্যা ও ভোট লুটের বিরুদ্ধে ১২ই জুলাই ২০২৩ কলকাতায় রানি রাসমনি রোড থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস পর্যন্ত মিছিল এবং গণতন্ত্র রক্ষার শপথ গ্রহণ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সি আই টি ইউ নেতা অনাদী সাহু, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী প্রমুখ। □

সংগঠনের মুখপত্র নিয়ে আলোচনা সভা

পাঠচক্র, পূর্ব বর্ধমান

পাঠচক্র, জলপাইগুড়ি

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি ধারাবাহিক ভাবে মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা সভা করে চলেছে। গত ৩১ জুলাই ২০২৩ পত্রিকার মার্চ-এপ্রিল '২৩ সংখ্যা নিয়ে সমিতি ভবনে আলোচনা সভা করে তারা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া এবং পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশীষ রায়। তাঁরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুখপত্রের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি '২৩ সংখ্যা নিয়ে জেলা সংগঠন দপ্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করেছে। □

মে দিবস এবং বর্তমান পরিস্থিতি

প্রণব কর

১৮৮৬ সালের ১ মে সারা আমেরিকা জুড়ে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট করেছিল কাজের সময় ১২ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘণ্টাতে কমিয়ে আনতে। তাকে কেন্দ্র করে ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে পুলিশের গুলি চালানো, চারজন শ্রমিক নেতার ফাঁসি, শ্রমজীবীদের আন্দোলনকে এক চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিল।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা দেশের সংগঠিত সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্যারিসে জড়ো হন প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের ছাঁদে আবারও একটি সংগঠন তৈরি করতে—পরবর্তীকালে যার নাম হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। এই সংগঠনের উদ্বোধনী সভায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা শুনতে পেলেন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৪-৮৬ সাল পর্যন্ত আমেরিকার শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথা। ইতিমধ্যে ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবর’ ১৮৯০ সালের ১ মে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী সভায় ১ মে তারিখটিকে আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হল।

সূচনা থেকেই মে দিবসের বৈপ্লবিক তাৎপর্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে একে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে একটি সংস্কারপন্থী আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত করার তীব্র প্রচেষ্টা জারি আছে, তাই মে দিবস সংস্কারপন্থীদের কাছে শুধুমাত্র কাজের সময় কমানোর একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন। কিন্তু বিপ্লবীদের কাছে মে দিবস আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ের শপথ নেবার দিন। এই প্রেক্ষাপটেই এবারের মে দিবস উদ্‌যাপনের সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করার একটা প্রচেষ্টা এখানে করা হচ্ছে।

বর্তমানে সাড়া বিশ্বজুড়ে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। বেহিসাবি ভাবে গৃহ ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে চাহিদার যে কৃত্রিম বুদবুদ তৈরি করা হয়েছিল ২০০৮ সালে তা ফেটে যেতেই, নব্য-উদার অর্থনীতি এক দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়। এর হাত থেকে শিল্পপতিদের বাঁচাতে এবং অর্থনীতির স্থবিরতা দূর করতে নব্য-উদারনীতির দাওয়াই অনুযায়ী শিল্পপতিদের প্রায় বিনা সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণের যোগান (bail out) দেওয়া হয়েছিল। আবার কোভিড অতিমারী পর্বে উন্নত বিশ্ব সহ সব দেশেই কোভিড পরিস্থিতি সামাল দিতে বিপুল পরিমাণ কোষাগারীয় ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এর ফলস্বরূপ সারা বিশ্বজুড়েই তৈরি হয়েছে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। ইউক্রেনের যুদ্ধও এই মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে।

এখন নব্য উদার অর্থনীতির অর্থ হল লগ্নীপুঁজির (finance capital) আধিপত্য। আবার লগ্নীপুঁজি চরিত্রগতভাবেই মুদ্রাস্ফীতির তীব্র বিরোধী, কারণ মুদ্রাস্ফীতি হলে আর্থিক সম্পদের অবমূল্যায়ন হয়, ফলে ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তীব্র চাপ পড়ে। তাই নব্য উদার অর্থনীতির এ সময়ে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দুটি পথ আছে—সুদের হার বৃদ্ধি করা অথবা বাজার চাহিদা হ্রাস করা। প্রথম পথটি অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি করা শিল্পপতিদের একেবারেই না-পসন্দ, কারণ তাহলে তাদের শিল্পের জন্য ঋণ নিতে গেলে বেশি সুদ দিতে হবে। ফলে দ্বিতীয় পথ অর্থাৎ চাহিদা হ্রাস করার উপরেই মূলত জোর দেওয়া হয়। আবার বাজারে চাহিদা হ্রাস করার সর্বোত্তম পথ হল বেকারত্ব বৃদ্ধি করা। কারণ বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে শ্রমজীবী মানুষের হাতে নগদ অর্থের যোগান কমে, ফলে বাজারের চাহিদাও কমে। এত্রে মনে রাখা দরকার যে শ্রমজীবী মানুষ তাদের আয়ের প্রায় সবটাই নিজেদের চাহিদা মেটাতে খরচ করে, তাদের সঞ্চয় করার কোনো সুযোগই থাকে না। চাহিদা কমার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দা আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্কট শ্রমজীবী মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে কিরকম মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের ঠিক আগেই লিজ ট্রাস মাত্র ৪৪ (চুয়াল্লিশ) দিনের জন্য বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি সুনককে হারিয়েই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি প্রতিশ্রুতি মতো শিল্পপতিদের জন্য বিপুল পরিমাণ কর মকুব করেন। আর এই কর মকুবের ঘাটতি তিনি পুরণ করার পরিকল্পনা করেন বন্ড ছেড়ে বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আর এর ফলে তিনি তার দলের মধ্যেই তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েন। কারণ বৃটেনের শিল্পপতিরা শুধু কর মকুবই প্রত্যাশা করেনি, তারা একই সঙ্গে এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারি খরচ হ্রাস করা হবে বলেও প্রত্যাশা করেছিল। তাহলে শ্রমজীবীদের চাকরি ছাঁটাই হত, ফলে বাজারে চাহিদা হ্রাস হত। ফলে শিল্পপতিদের প্রত্যাশা না পূরণ করতে পারার দায় নিয়ে মাত্র ৪৪ দিনের মাথায় শ্রীমতি লিজ ট্রাসকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিতে হয়। অর্থাৎ শিল্পপতিরা এখন শুধু তাদের কর ছাড় বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পেলেই খুশি হয় না, এই কর ছাড়ের বোঝা সরাসরি শ্রমজীবীদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে, তবেই তারা সন্তুষ্ট হবেন।

নব্য উদার অর্থনীতির এই দাওয়াইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছে সারা বিশ্ব জুড়েই। কিন্তু বামপন্থীদের আসছে।

এটা ঠিক যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে আমেরিকার রাজনৈতিক পরিসরে ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। আমেরিকার সিনেটে ১০০টি আসনের মধ্যে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান দল ৪৯টি আসন দখলে রেখেছে। আর ডেমোক্রটরা ৪৮টি। ৩ জন নির্দল প্রার্থীর সাহায্যে সিনেটে দখল রেখেছেন জো বাইডেন। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ ৪৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে রিপাবলিক দলের সদস্য ২২২ জন এবং ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য ২১৩ জন। একইভাবে বলা চলে যে ব্রাজিল নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী লুলা দ্য সিলভা জয়ী হলেও বোলসোনারোর সঙ্গে তার ভোটের পার্থক্য খুবই কম, মাত্র ১.৮ শতাংশ। সংখ্যার নিরিখে মাত্র ২০ লক্ষ।

কিন্তু যেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই অতি

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে শহীদ মিনার ময়দানে মে দিবস উপলক্ষ্যে সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের মুখ্য বক্তা ছিলেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। এছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের নেতারাও বক্তব্য রাখেন।

দুর্বলতার জন্য এই ক্ষোভকে পুঁজি করছে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিরা। কিন্তু যে অর্থনৈতিক নীতিগুলি মানুষের মধ্যে এই ক্ষোভ তৈরি করছে সেগুলিকে অতি দক্ষিণপন্থীরা রাজনীতির আঙ্গিনায় আনছেন না। নব্য উদার অর্থনীতি পরিলক্ষিত সাম্রাজ্যবাদ সারা বিশ্বজুড়ে সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য সাধারণ মানুষের উপর যে হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে এবং তার ফলে যে মানবিক সঙ্কট তৈরি হচ্ছে তাকেই অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতি উপজীব্য করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খনিজ তেলের উপর দখলদারি কায়েম রাখতে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্রে যে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে তার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক রাষ্ট্র থেকে সাধারণ মানুষ পালিয়ে গিয়ে ইউরোপে উদ্বাস্তু হিসেবে প্রবেশ করছে। অতি দক্ষিণপন্থী রাজনীতি এই অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদেরকেই ইউরোপের সঙ্কটের জন্য দায়ী করছে। একই রাজনীতি আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প করছেন, ব্রাজিলে জাইরে বোলসোনারো করছেন। অর্থাৎ অতি দক্ষিণপন্থীরা রাজনীতি থেকে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন। তার বদলে মানুষে মানুষে বিভেদের বিষয়গুলিকে রাজনীতির উপজীব্য করে তুলছেন।

সারা ইউরোপ জুড়ে অতি দক্ষিণপন্থী ও নব্য ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটছে। রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা সমাজে কায়েমি স্বার্থে আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান। কিন্তু অতি দক্ষিণপন্থীরা শাসকশ্রেণীর স্বার্থে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তীব্র পশ্চাৎমুখী প্রতিক্রিয়া শুরু করেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (E.U.) তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ইটালিতে মুসোলিনির ভক্ত নব্য ফ্যাসিস্ট দল ‘ব্রাদারস অব ইটালী’ অন্য দুটি অতি দক্ষিণপন্থী দলের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করেছে। ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে অতি-দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল আলায়েন্স-এর মারিন লেপেন ৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। জার্মানিতে ‘অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি’ নামক অতি দক্ষিণপন্থী দলটি ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। স্পেনে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নব্য গঠিত অতি দক্ষিণপন্থী দল ভক্স (Voice) উঠে এসেছে। সুইডেনেও একইভাবে অতি দক্ষিণপন্থীরা উঠে দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধেও পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদে, প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে উঠছেন। ইংল্যান্ডে সম্প্রতি প্রায় ৫ লক্ষ শিক্ষক, রেলকর্মী, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কর্মচারী, সরকারী কর্মীরা মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা নষ্ট করার প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছেন। ফ্রান্সে অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার প্রতিবাদে শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘট পালন করেছে। ইজরায়েলে নেতানিয়াহুয়ের নেতৃত্বাধীন অতি দক্ষিণপন্থী সরকার সম্প্রতি কেনেসেট-এ (ইজরায়েলের পার্লামেন্ট) চারটি বিল পাশ করে বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেন যাতে নেতানিয়াহুর দুর্নীতির কোনো বিচার না হয়। কিন্তু ইজরায়েলের সাধরণ মানুষ এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক জমায়েতের মধ্য দিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এই স্বৈরতান্ত্রিক চেষ্টার বিরুদ্ধে তারা ধর্মঘট করেছেন।

ভারতেও নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন অতি দক্ষিণপন্থী সরকার একের পর এক শ্রমজীবী মানুষের বিরুদ্ধে আক্রমণ নামিয়ে আনছে এবং তা থেকে মানুষের রোষকে অন্যদিকে পরিচালিত করতে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে চলেছে। গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে মোদি সরকার। এবারে লোকসভার বাজেট অধিবেশনে বিরোধী দলগুলিকে বক্তব্য রাখা বন্ধ করতে শাসকদল লোকসভার কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভণ্ডুল করে দেয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আদানি বিভিন্ন শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে চড়া করে রেখে শেয়ার মার্কেটে যে তছরূপ করেছে তা নিয়ে যাতে বিরোধীরা লোকসভায় আলোচনা করতে না পারে। এ ব্যাপারে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে সামনে এসেছে কিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা এল আই সি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার হাজার হাজার কোটি টাকা আদানির শেয়ার কেনার মধ্য দিয়ে তছরূপ করা হয়েছে। বিরোধীদের দাবি ছিল এ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি জে.পি.সি গঠন করতে হবে। কিন্তু সরকার পক্ষ পার্লামেন্টকে অচল করে দেবার ফলে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট মাত্র ১২ মিনিটে পাশ হয়ে গেল কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই। সেই বাজেটের মধ্য দিয়েও ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের উপর নামিয়ে আনা হয়েছে আক্রমণ। কর্মসংস্থান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভর্তুকি ক্ষেত্রে কী ব্যাপকভাবে ছাটাই করা হয়েছে তা নিচের টেবিলটি দেখলেই বোঝা যাবে—

প্রকল্প	২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	২০২৩-২৪ (কোটি টাকায়)
(i) এম জি এন রেগা	৮৯,৪০০	৬০,০০০ (৩৩% ছাটাই)
(ii) সারে ভর্তুকি	২,২৫,২০০	১,৭৫,১০০ (২২% ছাটাই)
(iii) খাদ্যে ভর্তুকি	২,১৫,০০০	১,৩৭,০০০ (৩৬% ছাটাই)

বাজেট পূর্ববর্তী আর্থিক সমীক্ষা থেকে শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক তথ্য বের হয়ে আসছে। কোভিড পূর্ববর্তী বেকারত্বের হার যেখানে ছিল ৭.২ শতাংশ, কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৩ শতাংশ। মোট কর্মনিযুক্তির সংখ্যা কোভিডের আগে ছিল ৪১.১ কোটি, কোভিড পরবর্তীতে তা কমে দাঁড়ায় ৪১ কোটিতে। একইভাবে লেবার পার্টিসিপেশন রেট ৪২.৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০.৫ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ভারতের শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবী সমাজও নব্য-উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। শোষনকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। এক বছরের উপর দিল্লিকে ঘিরে রেখে ভারতীয় কৃষকেরা মোদি সরকারকে বাধ্য করেছে তিনটি কৃষি আইনকে প্রত্যাহার করতে। শ্রমকোডগুলি আইনে পরিণত হলেও তা এখনও লাগু করতে পারেনি কেন্দ্র সরকার শ্রমিকদের আন্দোলনের চাপে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রতে কৃষকেরা দু’বার পদযাত্রা করে তাদের দাবি আদায় করে এনেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল তাদের দাবির মধ্যে ছিল সরকারী কর্মচারীদের দাবি—নিউ পেনশন স্কীম বাতিল করে ওল্ড পেনশন স্কীম লাগু করতে হবে। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীদের এক ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে এর মধ্য থেকে। গত ৫ এপ্রিল, ২০২৩ দিল্লীর রামলীলা ময়দান ১ লক্ষের উপর শ্রমিক-কৃষক ক্ষেতমজুর জমায়েত হন। সেখান থেকে ডাক দেওয়া হয় দেশ ও জনগণকে বাঁচাতে ২০২৩ সালে লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকারকে পরাস্ত করার।

এ বছরের মে দিবস ভারতবাসীদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এবছর ভারতবর্ষে মে দিবস পালনের একশো বছর পূর্তি হল। ১৯২৩ সাল এম সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার মাদ্রাজ শহরে লাল পতাকা উড়িয়ে মে দিবস পালন করেন। কিন্তু সেই তামিলনাড়ুর সরকারই বিধানসভায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীদের চাপে এ বছর ২১ এপ্রিল ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এ সংশোধন করে কাজের সময় ৮ ঘণ্টার বদলে ১২ ঘণ্টা করে। শ্রমজীবীদের চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত সরকার বিল রদ করলেও এই ঘটনা প্রমাণ করে মে দিবসের দাবির তাৎপর্য বর্তমান বিশ্বেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজ্যেও রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী পালনের নামে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তোলা, তাদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করা, এর বিরদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হবে।

এই মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক—

(i) শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য সুদৃঢ় করা শাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করা।

(ii) শ্রমিক-কৃষক ও কর্মচারীদের ঐক্যকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করা এবং সাধারণ দাবির ভিত্তিতে যৌথ কর্মসূচী নেওয়া।

(iii) শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটাকে তাদের প্রকৃত বন্ধু ও শত্রুকে চেনাবার জন্য সচেনতা বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা এবং তাদের সমস্ত শক্তিকে সাম্প্রদায়িক কর্পোরেট বোঝাপড়াকে ধ্বংস করতে ব্যবহার করা।

(iv) শ্রমিক-বিরোধী, জনগণ-বিরোধী এবং দেশ-বিরোধী সরকারকে পরাস্ত করা।

(v) সাধারণ জনগণের পক্ষে বিকল্প ব্যবস্থা নেবার জন্য লড়াইকে জোড়ালো করা। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

প্রশাসনের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই ৪ মে নবান্ন অভিযান

আলোচনাক্রমে কর্মচারীদের দাবি দাওয়া পূরণে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সুরাহা হওয়ার পরিবর্তে আক্রমণ ও বঞ্চনা আরও বেড়েছে। ২৮ নভেম্বর ২০১৮ নবান্নে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বরা। বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে টিফিন বিরতির সময় স্লোগান দেওয়ার অপরাধে(!) পুলিশ নবান্ন থেকে নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে শিবপুর থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে তাদের ছেড়ে দিলেও ১৫ জন নেতৃত্বকে দূরদূরান্তে বদলী করে দেওয়া হয় সংগঠনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য নিয়ে। জন্মলগ্ন থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে বহুবিধ আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কর্মী নেতৃত্বরা বরখাস্ত হয়েছেন। জরুরি অবস্থার সময় খুন হয়েছেন, কিন্তু সংগঠনকে ভয় দেখানো, ভেঙে ফেলা তো যায়ইনি, বরঞ্চ লড়াই আন্দোলনের যূথবদ্ধতায় তা আরও পরিশীলিত হয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে বর্তমান সরকারের প্রধান নিজে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে ফেলার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাঙা তো দূর অস্ত সাংগঠনিক শক্তিকে এক ফোঁটাও দুর্বল করতে পারেননি। ১০ মার্চ ২০২৩-এর ধর্মঘটে এ রাজ্যের সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে প্রদর্শিত করেছেন যা রাজ্য প্রশাসনের বুঁকে কাপন ধরিয়েছে। পরিস্থিতির এই গুণগত পরিবর্তনের নেপথ্যে কাজ করেছিল কর্মচারীদের হার না মানা মনোভাব। কর্মচারী সমাজের এই অনমনীয় মনোভাবে বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী ২৮ মার্চ ২০২৩ কর্মচারীদের চোর-ডাকাত বললেন, কারণ অধিকার আন্দোলনের বৃত্তটি দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ যৌথ মঞ্চ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই কুরুচিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে। পরবর্তীতে লাগাতার আন্দোলনের চাপে একই সঙ্গে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে বিগত ২১ এপ্রিল রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সচিবরা আলোচনায় বসলেন বটে, কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হল না। দেখছি, দেখবো, ভাবছি, ভাববোর বাইরে ৪২ শতাংশ ডি.এ সহ আরও বহুবিধা সুবিধাভোগীরা মাত্র ৬ শতাংশ ডি.এ পাওয়া রাজ্যের আপামর শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে অন্য কিছু বলতে পারলেন না। পরবর্তীতে যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বরা সিদ্ধান্ত নিলেন সরকারকে আরও বড় ধাক্কা দেওয়ার। ৪ মে কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়ে অতীতের সমস্ত অভিযানের কর্মসূচীকে ছাপিয়ে নবান্নের ভিত থেকে ১৪ তলা পর্যন্ত কাপন ধরানোর লক্ষ্যে পথে নামার, রাজপথকে অবরুদ্ধ করে নবান্ন অভিযানের।

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের ৪ মে নবান্ন অভিযানকে বানচাল করার উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংগঠনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি আছে কিনা(!) পরবর্তীতে আদালতের রায়ের চাপে হাওড়া স্টেশন থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথে অভিযান কর্মসূচী প্রতিপালন করতে দিতে বাধ্য হয় সেই পুলিশ প্রশাসনই। জমায়েতের বিশালতা পুলিশ প্রশাসনকে বাধ্য করে হাওড়া ময়দান থেকে যৌথ মঞ্চের তিন নেতৃত্বকে এসকর্ট করে নবান্নে পৌঁছে তাদের দাবিসনদকে প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়ার পরবর্তীতে পুনরায় তাদেরকে হাওড়া ময়দানের সমাবেশস্থলে পৌঁছে দিতে। হকের বকেয়া মহার্ঘভাতা / মহার্ঘ রিলিফ-এর দাবি, শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ ৯ দফা দাবিতে ৪ মে বেলা ২.৩০ মিনিটে হাওড়া ফেরীঘাট থেকে শুরু হওয়া ২৫ সহস্রাধিক অভিযানকারীর মিছিল হাওড়া শহরের রাজপথকে অবরুদ্ধ করে দেয়। মিছিলের নির্দিষ্ট পথ হাওড়া স্টেশন থেকে বঙ্কিম সেতু হয়ে জেলা শাসকের দপ্তরকে পাশে রেখে হাওড়া ময়দানে শরৎ সদনের সামনে সমাবেশস্থলে যখন বেলা ৩.৪৫ মিনিটে পৌঁছায় তখনও হাওড়া স্টেশন চত্বরে অগুনিত মানুষ অপেক্ষায় সমাবেশস্থলে যাওয়ার জন্য এতটাই ছিল মিছিলে বিশালতা। হাওড়া ময়দানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ পরিচালনা করেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ন তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন হিসাবে আদালতের নির্দেশ আমরা মেনে চলবে, তবে আমাদের হকের দাবিতে আন্দোলন চলবে। রাজ্য সরকারকে আমরা বলছি এরপরও যদি সরকারের টনক না নড়ে তাহলে আগামীতে আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে রাস্তায় নামব। সমাবেশে উপস্থিত যৌথ মঞ্চের ৩৬টি সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে সুকুমার পাইন, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে ধ্রুবশঙ্কর মণ্ডল, যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠী, জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে সুমন মৈত্র, অলবেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কমেন্স ফেডারেশনের পক্ষে দীপক মিত্র, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে সন্দীপ রায়, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে সঞ্জয় নাথ, স্টিয়ারিং কমিটির পক্ষে সংকেত চক্রবর্তী, জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রেড ইউনিয়ন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষে রতন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে বিশ্বনাথ রাহা, পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ যুক্ত কমিটির পক্ষে দেবাশীষ কুণ্ডু সহ নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও এদিনের নবান্ন অভিযান কর্মসূচীকে সহমর্মিতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষে সন্দীপ ঘোষ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন শুধুমাত্র প্রাপ্য মহার্ঘভাতা নয়, শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও আমাদের আন্দোলন। বেকার যুবক-যুবতীদের সরকারী দপ্তরে বিপুল শূন্যপদে স্থায়ী চাকরি প্রদানের পরিবর্তে চা, চপ আর মুড়ির দোকান দিতে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য কি মানুষ বর্তমান সরকারকে নির্বাচিত করেছিল। চা-চপ বিক্রি করেই যদি জীবন চলে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী নিজের পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম সহ তার মন্ত্রী বিধায়কদের পুত্র-কন্যাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ দিচ্ছেন না কেন? এদিনের যৌথ মঞ্চের মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের তৎপরতা ছিল। মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশের ব্যারিকেড যেমন ছিল, তেমনি জলকামান, টিয়ার গ্যাস হাতে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। মিছিলের যাত্রাপথ মুড়ে ফেলা হয়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরায়। তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে সমস্ত পূর্ববর্তী রেকর্ডকে ভেঙে ফেলে পঁচিশ সহস্রাধিক জনপ্লাবনের মিছিল থেকে স্লোগান যেমন নিজেদের দাবিতে উঠেছে, তেমনি স্লোগান উঠেছে, অবিলম্বে স্বচ্ছভাবে নিয়োগের, শূন্যপদ পূরণের, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর, ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করার, মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার। সার্বিকভাবে এদিনের নবান্ন অভিযানের ৯ দফা দাবি আবারও প্রমাণ করল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ শুধুমাত্র নিজ দাবিতেই পথে নামে না। একই সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের অংশ হিসাবে সাধারণ মানুষের দাবিকেও তাদের লড়াই-আন্দোলনে যুক্ত করে নিয়ে সংগ্রামের ময়দানে সামিল হয়। সমাবেশ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় সহ সুকুমার পাইন ও তাপস ত্রিপাঠী এই তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল নবান্নে গিয়ে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেন। নির্ধারিত বিকাল ৪.৩০ মিটিনে অভিযান ও সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, কর্মচারী সমাজ সহ আজকে উপস্থিত সকলে তাদের ক্ষোভের জানান দিয়েছেন, দাবি আদায় না হলে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে সামিল হবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ। হকের প্রাপ্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই জারি থাকবে। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

পার্টি (CPIM) এবং গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আঞ্চলিক স্তরে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা প্রতিপালন করতে থাকেন। সেই উত্তাল সময়ে জেলার প্রবাদপ্রতীম নেতৃত্বের সাহচর্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি পান ও অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরে বসবাস করা শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই কর্মচারী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন ও ক্রমে ক্রমে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক হন। ১৯৯৩ সালে তিনি কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যোগ দেন। তার নেতৃত্বদায়ী কর্মকুশলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির ৬৭তম রাজ্য সম্মেলন থেকে সমিতির যুগ্ম সম্পাদকপদে আসীন হন। পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন থেকে রাজ্য কো-অডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ও ২০২২ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সাথে তিনি ওই দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। বিশেষ করে ২০১১ সালের সরকারের পটপরিবর্তনের ফলে সমস্ত কর্মচারী সমাজকে একত্রিত করে রাখা বিভেদপন্থীদের থেকে রক্ষা করা কর্মচারী সমাজকে সাহস যোগানোর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি সরকারী কর্মচারী সহ মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসাবে অনুগামী সমাজের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আজীবন শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে বিশ্বাসী কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের অমায়িক ব্যবহার উন্নত রুচিশীলতা সকলের প্রতি সুমধুর আন্তরিকতা তাঁকে কর্মচারীদের আপনজনে পরিণত করেছিল। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথেও তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং অবশ্যই তিনি সুলেখক, সুবক্তা ও রাজনৈতিক লেখালেখির পাশাপাশি গল্প, কবিতা লেখায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। সুচিন্তক, সুলেখক, সুবক্তা ও রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতাসম্পন্ন কমরেড সমীর ভট্টাচার্যর প্রয়ান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়ে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করে দিল।

কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। তাঁর মরদেহ কলকাতায় কর্মচারী ভবন, ডব্লিউ বি এম ওএ (WBMOA) দপ্তর এবং ১২ই জুলাই কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, সভাপতি মানস দাস, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য, ডব্লু বি এম ও এ-র সাধারণ সম্পাদক অভীক সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কমরেড সমীর ভট্টাচার্যের ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহ এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দান করা হয়। তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বর্তমান। □

সুকান্ত চৌধুরী

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

মে দিবসের শপথ

মেরুদণ্ড সোজা রেখেই এগিয়ে যাই। এই স্বৈরাচারী সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে আমরা পথ দেখাতে পারব—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আজকের মে দিবসে এই শপথ আমরা গ্রহণ করব। সংবিধানকে রক্ষা করা, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ও মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষা করার আন্দোলন থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকব না। তাই আগামী ৪ মে নবান্ন অভিযানে নতুন ইতিহাস লেখার কারিগর আমরা সকলেই যথাযথ ভূমিকা পালন করব।

এরপর এই সভার মুখ্য বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী বক্তব্য উত্থাপন করেন। তিনি প্রথমেই সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ‘পৃথিবীর কোনায় কোনায় শ্রমজীবী মানুষ আজ যথাযথ মর্যাদায় মে দিবস পালন করছেন। ১৮৮৬ সালের অমর শহীদ কমরেডদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। আমাদের দেশে ও রাজ্যে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ শপথ নেয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের। আমাদের দেশে মে দিবস পালনের একটা ইতিহাস আছে। আজ থেকে ১০০ বছর আগে আজকের এই দিনে মাদ্রাজে এম সিঙ্গারাভেলু মে দিবসের পতাকা উত্তোলন করেন। লাল পতাকা না থাকায় লাল বস্ত্র ছিঁড়ে তাকে পতাকা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। আজ তার শতবর্ষ পূর্তির দিনে আমরা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার শপথ গ্রহণ করছি। ১৮৮৬ সালের ১ মে সফল ধর্মঘট ও ৪ মে পুলিশের গুলি চালনা, শ্রমিকের মৃত্যু, ব্যাপক ধরপাকড়ের মধ্যে দিয়ে মিথ্যা মামলায় কারা বন্দীদের আমরা স্মরণ করি। পুঁজিবাদ আজ ধ্বংসের মুখে। পুঁজির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ছে। ২০০৫ সাল থেকে যে মহামন্দা শুরু হয়েছে, সেই মহামন্দা থেকে মুক্তির পথ পুঁজিবাদ দেখাতে পারছে না। ত্রিশের দশকের মহামন্দার সময় তৎকালীন এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন যে এই মহামন্দা থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ হল সরকারি অর্থ বেশি করে ব্যবহার করা। সরকারী অর্থে গর্ত খোঁড় আবার সরকারী অর্থে তা ভর্তি কর। মূল কথা হল মানুষের হাতে কাজ দাও, মানুষের হাতে অর্থ দাও। ২০০৮ সাল থেকে পুঁজিবাদ তার মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পুঁজিবাদের গর্বের দিন শেষ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা বলছেন এই সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ সন্ধান করতে হবে মানুষের হাত ধরে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর যখন পুঁজিবাদ ঘোষণা করল সমাজতন্ত্র শেষ, পুঁজিবাদই শেষ কথা বলবে। আর এখন বলছে একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে গোটা দুনিয়া থেকে ধনীর দরিদ্রের বৈষম্য দূর করতে। ইতিহাসের শিক্ষা এবং মার্কসও বলেছেন পুঁজিবাদ থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন প্রক্রিয়ার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই হয়েছে।

সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পুঁজিবাদ নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। ১৯২১ সালে আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশে প্রবল তুষাড় ঝড় হয়েছিল। গোটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। আলো নেই, জল নেই—অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। নাগরিকদের এই চরম দুর্দশার দিনে ক্ষয়ক্ষতির অজুহাত দিয়ে বিদ্যুৎ সংস্থাগুলো বিদ্যুতের দাম ৭৫০ গুন বৃদ্ধি করেছিল। যারা দিতে পারল তাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হল। মুনাফাই হল শেষ কথা। সাদ্দামের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে এই বলে প্রচার করে কোনো প্রমাণ ছাড়াই আমেরিকা ইরাককে আক্রমণ করল। সাদ্দামকে গ্রেপ্তার করে সাজানো মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেওয়া হল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাককে পুনঃগঠন করবার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলো সেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করল। এখানেও সেই একই লক্ষ্য মুনাফা। কোভিড মহামারির আগে থেকেই গোটা বিশ্বের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়েছিল। দূর সঞ্চার শিক্ষার নামে নতুন নতুন অ্যাপ খোলা হল। প্রচার করা হচ্ছে এর মাধ্যমেই শিক্ষাকে ছাত্রছাত্রীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রথাগত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। কোভিড মহামারীর দুই বছরে কোনো কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া না বেড়ানো সত্ত্বেও পুঁজিপতিদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে ৪৫৩ কোটি মার্কিন ডলার। কোভিড মহামারিতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে গুটিয়ে ফেলে বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাছে তুলে দেওয়া প্রতিষেধক। নগদ মূল্য দিয়ে মানুষকে এই প্রতিষেধক কিনতে হল। বিপর্যয় থেকে যত খুশি তত মুনাফা কর এই হল পুঁজিবাদের নীতি। খরা, বন্যা, মহামারি সবগুলিই হল পুঁজির বিচরণ ক্ষেত্র। পরিবেশ সংকটের কথা আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি না। গোটা পৃথিবীতে উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনিষ্ট হচ্ছে। এইসব কিছুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে জারি রাখতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই নয়া উদার অর্থনীতির ধারক ও বাহক। মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমিকশ্রেণী আজ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকশ্রেণীর অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সবই আক্রান্ত। গত ৮ বছরে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্র বিক্রি করা হয়েছে। দেশ ক্রমশই দেউলিয়াতে পরিণত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

দেশজুড়ে এর বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও আমরা যৌথ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করছি। আগামী ৪ মে নবান্ন অভিযান এই যৌথ মঞ্চের কর্মসূচীকে আমাদের সফল করতেই হবে। ব্যাপক কর্মচারী জমায়েতের মধ্যে দিয়ে রাজ্যে দুর্নীতি এবং জনবিরোধী স্বৈরাচারী সরকারকে বার্তা দিতে হবে—আমরা ছিলাম, আছি, আগামীতেও থাকব।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি মানস দাস।

এরপর রক্তপতাকা ও বিভিন্ন দাবি সমন্বিত পোস্টারে সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ স্লোগান মুখরিত মিছিল কর্মচারী ভবন থেকে রওনা দেয় শহীদ মিনার ময়দানের কেন্দ্রীয় জমায়েতের উদ্দেশ্যে। □

সোমনাথ পোদ্দার

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

ধাক্কা খেল সরকার

মামলাটির শুনানি হয় (ডব্লু পি এ নং ১০৭০২/২০২৩; রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যান্য)। এই মামলায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এন মুখার্জি। উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রতিযুক্তি শোনার পর বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের মিছিলের অনুমোদন না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত, তাকেই নাকচ করে দেন এবং নির্দ্ধারিত দিন ও সময়ে নবান্ন অভিমুখী নির্দিষ্ট রুটে মিছিল করার অনুমতি দেন। সংবিধানের ১৯ নং ধারার পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে আদালতে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। নবান্ন অভিযান কর্মসূচীর মাস খানেক আগে গত ৬ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালিত হয় সারা রাজ্যে। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ ছিল এই কর্মবিরতির অন্যতম আহ্বায়ক। ঐদিন সারা রাজ্যে এবং কলকাতা হাইকোর্টেও কর্মবিরতির কর্মসূচীতে সর্বস্তরের কর্মচারী ও শিক্ষকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ক্ষিপ্ত হয়ে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ এক আইনজীবী কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে একটি জনস্বার্থে মামলা দায়ের করেন। লক্ষ্য ছিল কর্মবিরতি, ধর্মঘট প্রভৃতি প্রতিবাদের অস্ত্রগুলিকে আদালতের নির্দেশে ভোঁতা করা। কিন্তু এখানেও ঘটল ঠিক বিপরীত। প্রধান বিচারপতি স্পষ্টতই তাঁর পর্যবেক্ষণে বললেন, বারবার কর্মবিরতি বা ধর্মঘট কেন হচ্ছে সেই বিষয়ে সরকারের বিবেচনা করা দরকার। সরকারের উচিৎ আন্দোলনরত সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসা এবং একটি সমাধান সূত্র বের করা। প্রধান বিচারপতি ১৭ এপ্রিলের মধ্যে ঐ আলোচনা শেষ করে তাঁর এজলাসে এই বিষয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী তথা অ্যাডভোকেট জেনারেলকে সবিস্তারে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেন। প্রস্তাবিত আলোচনার তারিখ নির্দিষ্ট হয় ২১ এপ্রিল। কিন্তু কৌশলে মুখ্য সচিব, অর্থ সচিব প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের সাথে (আদালতের নির্দেশ ছিল তেমনই) প্রস্তাবিত ঐ আলোচনা থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহ যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়। এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরেই যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে একদিকে অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে চিঠি দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অপরদিকে আদালতের হস্তক্ষেপও চাওয়া হয়। দ্রুত এই উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে এবং আদালতের প্রত্যাশিত হস্তক্ষেপে যৌথ মঞ্চের দু'জন প্রতিনিধিকে ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যৌথ মঞ্চের পক্ষে বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং মোহনদাস পন্ডিত আলোচনায় অংশ নেন। যদিও ঐ আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্ফলা হয়েছিল। □

সুমিত ভট্টাচার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী ঃ এসো রক্তের বন্ধনে বাঁধি প্রাণ

উদ্বোধন করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল না। রক্তদাতাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের উৎসাহিত করতে ডাঃ অনুপ রায় উক্ত বক্তব্যগুলো বলেছেন। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ধারাবাহিক ভাবে রক্তদান কর্মসূচী করার জন্য। তিনি মঞ্চে সমীর ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুষ্প স্তবক দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরি। সাধারণ সম্পাদক স্বেচ্ছায় রক্তদানকারিদের উৎসাহ দিয়ে বলেন, মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের একটি বড় দিক। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলো ধারাবাহিকভাবে রক্তদান শিবির করছে। আজ কেন্দ্রীয়ভাবে এই রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের রক্তদান শিবিরে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে নাম নথিভুক্ত করেছেন পরিশেষে তিনি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রক্তদাতাদের সাথে দেখা করে তাদের উৎসাহিত করেন। শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করেন আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মানস দাস, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ কেন্দ্র, জেলা ও বিভিন্ন সমিতির নেতৃত্ব। এই দিনের এই রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়েছেন ১২ জন মহিলা সহ ৮৬ জন রক্তদাতা। □

সোমনাথ পোদ্দার

করমণ্ডল এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে শোক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র কেন্দ্রীয় কমিটির

ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রায় ৩০০ জন যাত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটি। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ সহ এত বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনের পাশাপাশি হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। দুর্ঘটনার রাত থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, ঝাড়গ্রামের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা-কর্মীরা সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত কর্মী-নেতৃত্বরা আহত যাত্রীদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। খড়গপুর, মেদিনীপুরের হাসপাতালে যাত্রীদের চিকিৎসার কাজে সহযোগিতা করেছেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী-নেতৃত্বরা রাজ্যের সর্বত্রই হতাহতদের পরিবারের কাছে পৌঁছেছেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। □

সুকান্ত চৌধুরী

টুকরো খবর

আর এস এস নির্দেশিত কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মেনে এ রাজ্যের সরকারও চালু করতে চলেছে ৪ বছরের স্নাতক পাঠক্রম। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হতে চলেছে এই নতুন শিক্ষানীতি। এই নতুন শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে স্নাতকস্তরেই পড়ুয়ারা গবেষণা করতে পারবে। স্নাতকোত্তর শেষ করা যাবে এক বছরেই। কিন্তু নতুন এই স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠক্রম চালু করার মতো পরিকাঠামো যে রাজ্যের অধিকাংশ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নেই তা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের তরফে সতর্কবার্তাও পাঠানো হয়। এর ঠিক উল্টো ছবি দেখা গেল কলেজে কলেজে দুর্নীতিমুক্ত ভর্তির জন্য অভিন্ন অ্যাডমিশন পোর্টাল চালুর ক্ষেত্রে। শিক্ষামন্ত্রীর আগাম আশ্বাস সত্ত্বেও এবছরও চালু করা হল না কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন ভর্তির পোর্টাল। □

বিবর্তনবাদের মতোই স্কুলের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে পর্যায় সারণীর মতো মৌলজ্ঞানকেও। বিজ্ঞান থেকে ইতিহাস, সাহিত্য থেকে সমাজবিজ্ঞান, পুনর্বিন্যাসের নামে পাঠ্যসূচীতে দেদার ছাটাই করছে এনসিইআরটি। বিবর্তনবাদকে বাদ দেওয়াকে যেমন বায়োলজিকে বাদ দিয়ে বায়োলজি পড়ানোর সাথে তুলনা করেছিলেন দেশের বিজ্ঞানীমহল, পর্যায় সারণি বাদ পড়াতেও তাঁরা একইপ্রকার বিস্মিত। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতে যুক্তিবাদী চিন্তা, মুক্তিচিন্তা, জ্ঞানদীপ্তি, পশ্চিমে শুরু হওয়া ভাবধারা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে শিক্ষাকে। আসল উদ্দেশ্য ইতিহাসের বিকৃতি, এর শিকার হচ্ছে বিজ্ঞানও। □

অবিলম্বে ফোর জি এবং ফাইভ জি পরিষেবা চালু করা সহ তিন দফা দাবিতে পয়লা জুন দেশের সর্বত্র মানব বন্ধনে শামিল হলেন বিএসএনএল কর্মীরা। দেশব্যাপী এই কর্মসূচীতে বিভিন্ন নন এগজিকিউটিভ ইউনিয়ন এবং এ্যাসোসিয়েশনগুলির পক্ষ থেকে বেতন সংশোধন এবং পদোন্নতির নতুন নীতি ঘোষণার দাবিও জানানো হয়। এদিন রাজ্যের সব বি এস এন এল দপ্তরগুলির সাথে কলকাতার বিবাদি বাগে টেলিফোন ভবন এবং সিটিওতে দুপুর দেড়টা থেকে এই কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মচারীরা প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুনসহ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। পেনশনারদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও এই কর্মসূচীকে সমর্থন জানানো হয়। পরবর্তীতে ১৪ জুন সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে একই দাবিতে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। □

এ বছর থেকেই আইএফএ পরিচালিত মহিলাদের শিল্ড চালু হয়েছে এবং প্রথম বছরে ফাইনালে শ্রীভূমি এফসিকে ৫-০ ফলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দল। হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করেন তুলসী হেমব্রম। ১৫টি গোল করে টুর্নামেন্টের সেরাও নির্বাচিত হয়েছেন তুলসী। চলতি বছরে দ্বিতীয় ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দল। আইএফএ-এর পক্ষ থেকে জয়ী দলের হাতে পুরস্কার স্বরূপ তোয়ালে তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এই ঘটনার সমালোচনা করা হয়। □

কেরালা হল ভারতের মধ্যে প্রথম রাজ্য যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেল। কেরালার বর্তমান রাজ্য সরকার চালু করল কে-ফন (কেরালা ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক) প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেরালায় ডিজিটাল বিভাজনের মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে দিয়ে রাজ্যের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী সকলকে নিখরচায় ইন্টারনেট পরিষেবার সুযোগ দেবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে দুর্বল ২০ লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩০ হাজারেরও বেশি সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, এই প্রকল্পে রাজ্যের মানুষের অনেকদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। □

ফ্রান্সে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে ধর্মঘটে শামিল হলেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্র অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে গত জানুয়ারি মাস থেকে চলছে লাগাতার আন্দোলন। সেই আন্দোলন সংগ্রামের অংশ হিসেবে গত ৫ জুন বিকেল ৬টা থেকে এই ধর্মঘট শুরু হয় এবং ৭ জুন সকাল ৭টা অবধি এই ধর্মঘট চলে। পাশাপাশি ৬ জুন গোটা দেশজুড়ে পালিত হয় নানা প্রতিবাদ কর্মসূচী। বিভিন্ন শহরে ২৫০টিরও বেশি মিছিল সংঘটিত হয়। বিভিন্ন শহরে এই মিছিলে ৫-৬ লক্ষ মানুষ যোগ দেন। আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সরকার একতরফা ভাবে অবসর আইন চাপিয়ে দিলেও শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতি মানুষ রাজপথের লড়াই থেকে সরবে না। □

খারাপ আবহাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন, জল সংক্রান্ত সমস্যার কারণে গত বছর দেশে কমপক্ষে ২,২২৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে। ১৯৭০ থেকে ২০২১, এই ৫১ বছরের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে এই দেশ অন্তত ৫৭৩টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে পড়েছে, যার ফলে প্রাণহানি ঘটেছে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার জনের। রাষ্ট্রসংঘের 'ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিকাল ডিপার্টমেন্টের' তথ্য থেকে এমন পরিসংখ্যান জানা গিয়েছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এবং গোটা বিশ্বে ১১ হাজার ৭৭৮টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনায় ৪৩ লক্ষ কোটি ডলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এই ২০ লক্ষ প্রাণহানির ৯০ শতাংশই ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বিশ্বজুড়েই জলবায়ুর পরিবর্তন এক জ্বলন্ত সমস্যা ডব্লু এম ও প্রধান পেত্তেরি তালাস বলেন, "পিছিয়ে থাকা অংশই মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার শিকার হয়। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সম্প্রতি মায়ানমার ও বাংলাদেশে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে। গরিব থেকে অতিগরিব অংশের মধ্যেই এর প্রভাব পড়েছে বেশি।" □

২০১৮ সালের পর ফের ফুটবলের ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিতল ভারত। এবার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লেবাননকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল সুনীল ছেত্রীর দল। ভারতের পক্ষে গোল দুটি করেন সুনীল ছেত্রী এবং ছাংতে। এই প্রতিযোগিতায় একটিও গোল হজম না করে মোট পাঁচটি গোল করেছে ইগর স্টিমাচের প্রশিক্ষণাধীন ভারত। □

একশো বছর আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওসানগেট নামক একটি সংস্থা টাইটান নামে একটি ডুবো জাহাজ তৈরি করে। মাথা পিছু দু'কোটি টাকার বিনিময়ে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়ার সুযোগ মিলতো। এই সফরের সময়েই ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আটলান্টিকে ডুব দেওয়ার পৌনে দু'ঘণ্টার মাথায় টাইটানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে প্রবল জলের চাপ সহ্য করতে না পারায় ডুবো যানটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। আবার কারো কারো মতে আণুবীক্ষণিক পথে জল ঢুকে ভেতরের চাপ রক্ষা করার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ভেতর থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। টাইটানের এই সফরে নির্মাতা সংস্থা ওসানগেটের সিইও সহ মোট পাঁচজন যাত্রী ছিলেন, যাদের সকলেরই মৃত্যু ঘটেছে। টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৬০০ ফুট দূরে টাইটানের ভাঙা টুকরোর হদিস মিলেছে। □

ডিজিটালের রমরমার যুগে আর পাঁচটা পত্রপত্রিকার মতোই টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'। ওয়াশিংটন ভিত্তিক এই শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকা তাদের সর্বশেষ বেতনভুক্ত বা নিজস্ব লেখকদেরও ছাটাই করে দিয়েছে। অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই পত্রিকা প্রথমবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হেঁটে ছিল ২০১৫ সালে। ওই সময় পত্রিকার ৬ জন শীর্ষ সম্পাদকের চাকরি চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে এই নিয়ে চারবার তারা কর্মচারীদের ছাঁটাই করেছে। এই সাময়িকী পত্রিকার কয়েক হাজার কর্মচারী ইতিমধ্যেই চাকরি হারিয়েছেন। ১৮৮৮ সালে এই সাময়িকীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ১৭ লক্ষেরও বেশি। তবু ডিজিটালাইজেশনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথই বেছে নিতে হল এই ১৩৫ বছরের পত্রিকার। □

দীপঙ্কর বাগচী

শোক সংবাদ

সুনীত চোপরা

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক কমরেড সুনীত চোপরা গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে যাওয়ার সময় মেট্রো রেল স্টেশনের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে পড়ার সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন কমরেড সুনীত চোপরা। সেখানের পড়াশোনা শেষ করার পরে কমরেড চোপরা প্যালেস্তাইন মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন রিজিওনাল ডেভেলপমেন্টে যুক্ত হন এবং ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮০ সালে সর্বভারতীয় যুব সংগঠন তৈরি হলে তিনি সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্প্রতি হাওড়ায় অনুষ্ঠিত সংগঠনের দশম জাতীয় সম্মেলনে তিনি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

শিল্পকলা সম্পর্কে কমরেড চোপড়ার বিপুল জ্ঞান এবং পড়াশোনা ছিল। শিল্প সমালোচক হিসাবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। সারা ভারত ইন্দো-কোরিয়ান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের পদেও ছিলেন। জাতীয় সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনগুলিতে তার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তার মৃত্যুতে শুধু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়, ক্ষতি হল ভারতের সমগ্র গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের। তিনি ছিলেন মনে প্রানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মার্কসবাদী। ক্লান্তিহীনভাবে তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে গিয়েছেন। □

সমরেশ মজুমদার

বিগত ৮ মে ২০২৩, সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। চলে গেলেন সমরেশ মজুমদার। বাংলা সাহিত্যে উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ ট্রিলজির জনক সমরেশ মজুমদারের বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। গত দশ বছরের বেশি সময় ধরেই ক্রনিক অবস্থাজনিত পালমোনারি ডিজিজের (সি ও পি ডি) সমস্যা ছিল। সেই সমস্যার চিকিৎসাও নিয়মিত হত। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কিছুদিন আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই সময়ে ফুসফুস ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ নিয়ে ভুগছিলেন।

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪২, উত্তরবঙ্গের গয়েরকাটায়। লেখকের শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চা বাগানে। প্রাথমিক শিক্ষা জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৬০ সালে কলকাতার চলে আসেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ সালে সমরেশ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' প্রকাশিত হয়। কর্মজীবন শুরু করেন একটি বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে। এছাড়া লেখকের গর্ভধারিনী, বুনো হাঁস, দৌড়, সাতকাহন, তেরো পার্বন, স্বপ্নের বাজার, উজান-গঙ্গা, ভিক্টোরিয়ার বাগান, আটকুঠুরি নয় দরজা, অনুরাগ, অগ্নিপথ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপন্যাস 'কালবেলা' এবং 'বুনো হাঁস' অবলম্বনে তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় বাংলা ছবি। কালবেলা উপন্যাসের জন্য ১৯৮৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। 'কলকাতায় নবকুমার'-এর জন্য ২০০৯ সালে বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হন। আজীবন তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিমতলা শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সাহিত্যিকের বাড়িতে গিয়ে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্টজনেরা। শ্রদ্ধা জানান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান এবং প্রয়াত সাহিত্যিকের বিশেষ বন্ধুপ্রতিম বিমান বসু।

বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রতিনিধিরাও তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে হাজির ছিলেন শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে। □

কল্যানী কাজী

প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট নজরুলগীতি শিল্পী, কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যানী কাজী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার ১২ মে '২৩ ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এস এস কে এম হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। কাজী নজরুলের পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের স্ত্রী ছিলেন কল্যানী কাজী। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাডেমীর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

মধ্য কলকাতায় গোবরা ১ নম্বর গোরস্থানে কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্র, কাজী অনিরুদ্ধের কবরের পাশেই তার ইচ্ছানুসারে সমাধিস্থ করা হয়।

তার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগৎ ছাড়াও সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে শোকের আবহ নেমে আসে।

তাঁর প্রয়ানের সময় তার দুই পুত্র কাজী অনির্বান ও কাজী অরিন্দম উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন কাজী অরিন্দমের স্ত্রী সুপর্ণা ভৌমিক সহ নাতি নাতনিরা।

শিল্পীর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতে বিশেষ করে নজরুলগীতির এক অপূরনীয় ক্ষতি হল। □

বিজন চক্রবর্তী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা মধ্যাঞ্চলের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A) প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক এবং জেলা কর্মচারী আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড বিজন চক্রবর্তী গত ৮ মার্চ, ২০২৩ সকালে প্রয়াত হয়েছেন। কমরেড চক্রবর্তী গত ফেব্রুয়ারি '২৩ থেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে ই.এম. বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি কিডনিজনিত অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর প্রয়াণে সমগ্র কর্মচারী সমাজ তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীবৃন্দ শোকাহত ও মর্মাহত। কমরেড বিজন চক্রবর্তীর পরিবারের স্ত্রী এক পুত্র ও কন্যা বর্তমান। □

মৃণাল চ্যাটার্জী

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নব মহাকরণ অঞ্চলের প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক কমরেড মৃণাল চ্যাটার্জী গত ১৩-০৪-২০২৩ তারিখে নিজবাসভবনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ১৪-০৪-২০২৩ তারিখে রাত্রি ১.৪০ মিনিটে প্রয়াত হন।

প্রয়াত কমরেড মৃণাল চ্যাটার্জী ভেটেরেনারী ডাইরেক্টরেটের অধীন ইসলামপুরে ভেটেরেনারী ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ বদলী হয়ে আসেন এবং সমিতির কর্মী থেকে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। কমরেড মৃণাল চ্যাটার্জী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নব মহাকরণ অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে আমৃত্যু আস্থাশীল থেকেই কমরেড চ্যাটার্জী কর্মচারী আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন এবং কর্মচারী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। কমরেড মৃণাল চ্যাটার্জীর পরিবারে তাঁর স্ত্রী বর্তমান। □

মানবকান্তি ঘোষ

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্টস এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানবকান্তি ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, শনিবার সকাল ৭.৫০ মিনিটে কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে। ওই হাসপাতালে তার হৃদরোগের চিকিৎসা চলছিল। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

সংগঠনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, সংগঠকদের পারিবারিক খোঁজ খবর নেওয়া, প্রয়োজনে তাদের বিভিন্ন সাহায্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সমিতি অথবা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে ডাকা যে কোনো মিটিং মিছিলে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে শ্লোগান দেবার জন্য অনুরাগী কর্মচারী সমাজকে উৎসাহিত করতেন।

কমরেড মানবকান্তি ঘোষের পরিবারে স্ত্রী, দুই পুত্র এবং পুত্রবধূ সহ এক নাতি, এক নাতনি বর্তমান। □

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক ও মুখপত্র 'সংযোগ'-এর প্রথম সভাপতি কমরেড রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪শে মে ২০২৩ দুপুর ১টার সময় কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। কমরেড বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মজীবনে রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র 'এমপ্লয়িজ ফোরাম'-এর প্রকাশনার সঙ্গেও তিনি যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। অবসরের পরে তিনি রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'প্রবীণ কণ্ঠ'-র সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আজীবন শ্রমজীবী মানুষের আদর্শে বিশ্বাসী থেকে কাজ করে গিয়েছেন। □

সুকান্ত চৌধুরী

প্রসঙ্গ ঃ চ্যাট জিপিটি

সেলিম মিয়া, অভিরূপ স্যার কিংবা মৃত শ্রমের অন্ত্যেষ্টি পর্ব

মানস দাস
সভাপতি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

পাকা ধানে মই

বর্ধমানে ব্লক সফর চলাকালীন দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে বিশাল বিশাল ট্রেলারের মত যন্ত্রগাড়ী সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ধান কাটার মরশুম। এখন আর ক্ষেতমজুর জমিতে নেমে ধান ঝাড়াই করে গোলায় তোলে না। এই গাড়ীগুলি নেমে পড়বে জমিতে, ধান কেটে, বেছে খড় থেকে আলাদা করে প্যাকেটবন্দী করে নিমেষের মধ্যে ফেরত চলে আসবে। যন্ত্রের কাছে হেরে গিয়ে কাজ হারিয়েছে প্রান্তিক শ্রমজীবি মানুষ। এই যন্ত্রগাড়ির ডাক নাম ক্র্যাসার, পোষাকি নাম 'Paddy Harvester Machine'। ঘণ্টায় ৩ একর জমিতে পাকা ধান কেটে-ঝেড়ে বস্তা বন্দী করতে সক্ষম। একই পরিমাণ পাকা ধান একই সময়ে কৃষি শ্রমিক দিয়ে কেটে - ঝেড়ে - বস্তা বোঝাই করতে ৩৯-৫১ জন কৃষি শ্রমিক প্রয়োজন। যন্ত্রের এ বাবদ খরচ ৩০০০ টাকা আর ঐ একই কাজ কৃষি শ্রমিকদের দিয়ে করাতে হলে ন্যূনতম খরচ ১৮০০০ টাকা সাথে প্রত্যেককে দিতে হবে ২ কেজি করে চাল। তারপর অত দ্রুত কাজ করা অসম্ভব! মালিক বোকা নয় মুনাফা বোঝে তাই যন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকে পাকা ধানের ক্ষেতের ধারে, ফসল তোলার অপেক্ষায়। উল্টোদিকে, কৃষি শ্রমিকের পাকা ধানে একেই বোধহয় মই দেওয়া বলে। সুতরাং জন্ হেনরীর মতো মানুষের আর মেশিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া হলো না! হাজার হাজার সেলিম মিয়া আর জনার্দন ভাইয়েদের হাতের কাজ দখল করে নিচ্ছে যন্ত্র। শুধু ক্ষেতে নয় ছোট-বড় শিল্পে। এটা তো একটি ছোট্ট নমুনা।

মালিকের উত্তরোত্তর মুনাফা বৃদ্ধির উপায় মাত্র দুটি। এক, সরাসরি শ্রমিকের দৈনিক কাজের সময় বাড়ানো, তার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানো। পুঁজিবাদের জন্মলগ্ন থেকে শ্রমসময় কমানোর দাবি নিয়ে লড়াই করেছে শ্রমজীবি মানুষ। এখন তো আবার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর নামে আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিরামহীন কাজ করানো হচ্ছে। আমেরিকায় সারাদিন কাজের পর শ্রমিকেরা যখন সন্ধ্যায় ছুটিতে থাকে, তখন ভারতের 'সস্তা শ্রম' হাই তুলতে তুলতে ঘুম ভেঙ্গে কাজে ঢুকে পড়ছে। মালিকের দ্বিতীয় উপায় ঃ একই সময় কাজ করিয়ে বা কাজ কম করিয়ে ও কম পয়সা জীবন্ত শ্রমের পিছনে খরচ করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে নেওয়া। উৎপাদন বাড়ানো একই শ্রমে অর্থাৎ আরো উদ্বৃত্ত মূল্য। এমনকি অনেক কম শ্রমিক দিয়ে নানাবিধ কাজ নিমেষে। প্রথম উপায়ে নানা হ্যাপা পোয়াতে হয় মালিককে, শ্রমিকদের স্বাভাবিক বিরোধিতা, শ্রমসময় কমানোর দাবি, ধর্মঘট ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয়টা আরো মসৃণ। রক্তপাতবিহীন শোষণ!

'নমো যন্ত্র, নমো — যন্ত্র...'

এই দ্বিতীয় পন্থায় সাম্প্রতিকতম চেহারা হলো এ আই (Artificial Inteligence), রবোটিক্স। শ্রমিক ছাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন চায় পুঁজিবাদ! 'ফোর্বস' পত্রিকার প্রকাশিত একটি হিসেব, ২০৩০-এর মধ্যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দৌলতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ কাজ হারাবেন। কর্মক্ষম মানুষের কাজ করবে রোবট এবং কম্পিউটার। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মার্চ অবধি এ সংক্রান্ত গবেষণায় বিনিয়োগ হয়েছে ৯৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! প্রসঙ্গত ২০২২ সালের মার্চ মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক স্থির করে গোটা দুনিয়ায় খাদ্য সংকট দূর করার জন্য আগামী ১৫ মাসে খরচ করা হবে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ দুটি তথ্য জানিয়ে দেয় পুঁজিবাদের ঝোঁক কোন দিকে!

দেবে উত্তর। বিষয়বস্তু দিয়ে দিলে গল্প, কবিতা, উপন্যাস মায় প্রবন্ধ লিখে দেবে, ছবি এঁকে দেবে, কৃত্রিম ভিডিও বা মিউজিকও কম্পোজ করে দেবে — বসে আছে চ্যাট - জিপিটি শুধু নির্দেশের অপেক্ষা! আপাতত গুগল ফেল! সে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে আরো দক্ষতা বাড়াবার লক্ষ্যে।

কায়িক শ্রম দখল করেছে যন্ত্র বহু আগেই, এখন মেধা শ্রমের দায়িত্ব বেশি বেশি করে চলে যাবে A. I.-এর হাতে। মানব সভ্যতা আরো উন্নত হওয়ার কথা, মানুষের কাজ যদি যন্ত্র করে দেয় মানুষ আরো উন্নত কাজে মস্তিষ্ক ব্যবহার করবে এটা সোজা অঙ্ক। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা শুরু করেছে উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে। চ্যাট জিপিটি আসা মাত্র

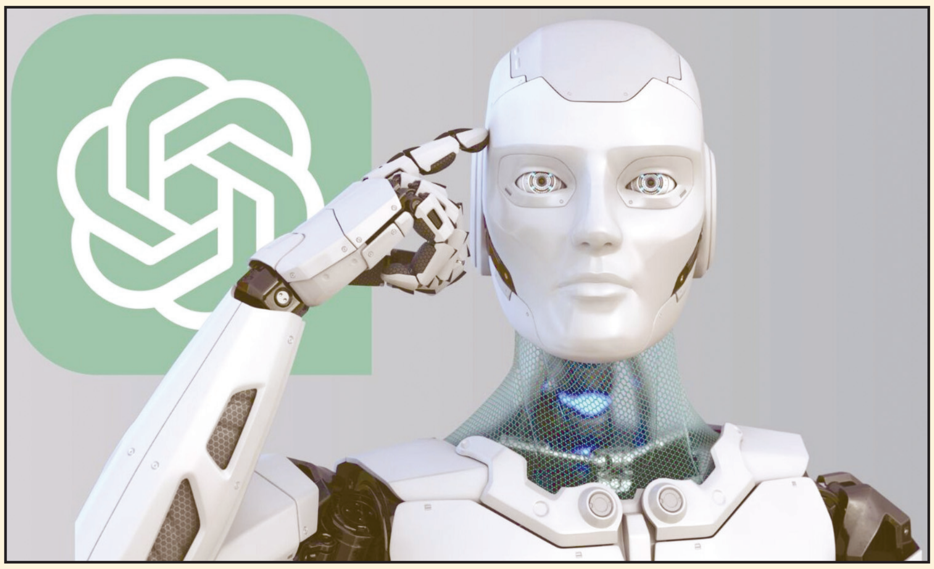

অবশ্যি একাজ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। উল্লেখ্য, বহু প্রযুক্তিবিদের সাথে অ্যালান টিউরিং ১৯৫০-এ লিখেছিলেন 'কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স' নামে একটি গবেষণাপত্র। মোদ্দা কথা মানুষকে নকল করার যন্ত্র। মানুষের প্রশ্নে যন্ত্রের উত্তর দেওয়ার প্রযুক্তিরই নাম চ্যাটবট বা ১৯৬৬ সালে জোসেফ উৎজেনবামের কম্পিউটার প্রোগ্রাম 'এলিজা'-র আধুনিকতম সংস্করণ — চ্যাট জিপিটি আজ দুনিয়া জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। পুরো নাম Chat - Generative Pretrained Transformer। ২০১৫ সাল থেকে এলন মাস্ক এবং স্যাম অল্টম্যান কোমর বেঁধে লাগলেন, তারা তৈরী করলেন 'ওপেন এ আই' সংস্থা। পরে অবশ্য এলন মাস্ক বেরিয়ে যান এই কোম্পানী থেকে।

২০২২ এর ৩০ নভেম্বর জনসমক্ষে আসে চ্যাট - জিপিটি। শুরু থেকেই তোলপাড়। এক সপ্তাহে ১০ লাখ ব্যবহারকারীর কাছে এটি পৌঁছে গিয়েছে। আপনি মোবাইল বা কম্পিউটারে চ্যাট জিপিটি থাকলে, জানতে চাইলে, সে আপনাকেই দিয়ে

বহু কর্পোরেট ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার উপর আর উল্টোদিকে বিশ্বজুড়ে বহু অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা আশঙ্কা করছেন 'হোয়াইট কলার জব' বা মেধাভিত্তিক পেশা এবার ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবে। সুতরাং ছাঁটাই এবং ছাঁটাই।

সিবিএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুগল সি ই ও 'সুন্দর পিচাই' বলছেন—"এই প্রযুক্তির ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অগ্রগতি বাধা পেতে পারে।" তার মতে, মূলত লেখক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রযুক্তিবিদদের মতো পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সমস্যা হতে পারে। শুধু কাজ হারানো নয় নতুন প্রজন্ম চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে।

এমনকি চ্যাট-জিপিটি যারা তৈরি করেছেন তাদের চাকরিও সুরক্ষিত নয়। টেসলা'র সি ই ও এলন মাস্ক, অ্যাপেলের স্টিভ ওজনিয়াক সহ শতাধিক প্রযুক্তিবিদ চ্যাটবট ল্যাবগুলিকে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন জিপিটি-৪ এর থেকে উন্নত চ্যাটবটের গবেষণা বন্ধ রাখা হোক এবং সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব দেখতে তৃতীয় কোন পক্ষ দিয়ে সমীক্ষা চালানো হোক। মোদ্দা কথায়—

এতদিন কায়িক শ্রম হারানো সেলিম মিয়াদের কাজ হারাবার লাইনে এবার মেধাশ্রমের কাজ হারিয়ে প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করা অভিরূপ স্যারেরাও সামিল হবেন! এই কাজ হারাবার লাইনে সামিল হবেন পুঁজিবাদের পক্ষে সোচ্চারিত এতদিনের সমর্থকেরাও।

মৃত শ্রমের উল্লাস না অন্ত্যেষ্টি

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক সারা পৃথিবীর যাবতীয় উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে করে নিতে সক্ষম হলো পুঁজিবাদ। নো শ্রমিক! তাহলে, গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ কি এক শ্রমিকহীন-শোষণহীন পুঁজিবাদের জন্ম দেবে? উত্তর এক কথায়—না।

প্রথমতঃ বিপুল উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী হলেই তা ভোগ না করলে মুনাফা হয় না। পৃথিবীতে কাজ হারানো অযুত কোটি মানুষের হাতে পয়সা না থাকলে উৎপাদিত জিনিসের বাজারে বিকোবার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। অর্থাৎ হয় বিপুল উৎপাদিত বস্তুকে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে নতুবা বিলিয়ে দিতে হবে। পুঁজিবাদের সংকট — আরো গভীর থেকে গভীরতম হবে।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন যন্ত্র বা প্রযুক্তি শত শত বছর ধরে চলা পূর্বের কোন শ্রমের বস্তুগত চেহারা বা পুঞ্জিভূত শ্রম। এই পুঞ্জিভূত শ্রম ব্যবহার হয়ে আসছে জীবন্ত শ্রমকে শোষণ করার জন্য আর তার থেকে সঞ্চিত হচ্ছে মৃত শ্রম (পুঁজি)। কিশোর কবি সুকান্ত লিখে গিয়েছিলেন 'শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার, তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড় — হিসাব কি দিবি তার...'। সত্যিই তো আর মানুষের হাড় জমা হয় না, মালিকের জমে শ্রমিকের মৃত শ্রম অর্থাৎ পুঁজি। রূপকার্থে লিখেছিলেন কবি। মার্কসের কথায় মৃত শ্রম যা জীবন্ত শ্রমকে শোষণ করে। যন্ত্র বা প্রযুক্তি (যা আসলে শ্রমিকের শ্রমজাত) পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের কারণেই আজ তা আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে থেকে যাচ্ছে।

এতদ্‌সত্বেও মৃত শ্রম-এর শোষণ করার ক্ষমতা আজ প্রশ্নের মুখে, এই ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ কারণেই। যখন ইলন মাস্করা মঙ্গলগ্রহে বাড়ী বানাবার স্বপ্ন দেখছেন তখন পৃথিবীতে কাজ হারানো কোটি কোটি হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হবে—শপথ নেবেই এ ব্যবস্থা বদল করার লক্ষ্যে। প্রসঙ্গত এবছর জানুয়ারীতে ইলন মাস্কের বান্ধবী কানাডা গায়িকা গ্রিমেস সোস্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেন। একটি ম্যানিফেস্টো হাতে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। ক্যাপসানে ইলনের সাথে বিচ্ছেদের খবর। পুঁজিবাদের লালসা আর ভোগলিপ্সার প্রতি বৈরিতা, প্রতীকি হিসাবে এই ছবির থেকে সুন্দর আর কি হতে পারে! □

বিজেপিমুক্ত দক্ষিণ ভারত

কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের বড় জয় কংগ্রেসের। কর্ণাটক বিধানসভায় মোট আসন ২২৪টি। নির্বাচনে ফলাফল কংগ্রেস-১৩৭ (+৫৭), বিজেপি-৬৫ (–৩৯), জনতা দল (এস)-১৯ (–১৮), অন্যান্য-৩। ভোট শতাংশের বিচারে কংগ্রেস গত বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে অনেকটা বাড়িয়ে ৪৩ শতাংশ মানুষের সমর্থন আদায় করেছে। বিজেপির ভোট গতবারের মতো থাকলেও (৩৬%) উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে আসন সংখ্যা। বিদায়ী মন্ত্রিসভার ২৬ জন মন্ত্রীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। পরাস্ত হয়েছেন ১২ জন। লক্ষণীয়ভাবে কমেছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি দেবেগৌড়ার দলের আসন, ৩৭ থেকে কমে হয়েছে ১৯, শতাংশের হিসেবে ৫ শতাংশ সমর্থন।

কংগ্রেসের প্রচারের মূল হাতিয়ার ছিল 'সুশাসন' ও দুর্নীতিমুক্ত কর্ণাটক গড়ে তোলা। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথে এই বার্তা পৌঁছে দেয় সাধারণ ভোটারদের কাছে। পাশাপাশি জীবন জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত পাঁচ 'গ্যারান্টি'র কথা ঘোষণা করে। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, বেপরোয়া দুর্নীতি, বেকারত্বর বিপরীতে কংগ্রেসের রুটি রুজির প্রচার কর্ণাটকের মানুষ যে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তা স্পষ্ট হয়েছে আসন সংখ্যার দিকে তাকালে। বুথ ফেরত সমীক্ষায় ত্রিশঙ্কু বিধানসভার আভাসকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বিপুল জয় হাসি করে নেয় কংগ্রেস।

'৫৬' ইঞ্চির মিথ। বিজেপি অপরাজেয়। নরেন্দ্র মোদি অপরিহার্য—এই সকল বস্তাপচা ধারণাকে হেলায় ভুলুণ্ঠিত করে দিল কর্ণাটকবাসী। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও সংবিধানকে সুরক্ষিত করার জন্য মানুষ যদি মনস্থির করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বিরোধী শক্তি যদি জোটবদ্ধ হয় তাহলে আগামী লোকসভা নির্বাচনেই যে মোদি জমানার অবসান নিশ্চিত তার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিয়েছেন কর্ণাটকের মানুষ। সাধারণ জনগন সাম্প্রদায়িক বিভাজন, হিংসা, বিদ্বেষ, ধর্মীয় হানাহানি সহ্য করেন না। তাঁরা চান প্রশাসনে স্বচ্ছতা। রুটি রুজির বন্দোবস্ত। মূল্যবৃদ্ধি থেকে রেহাই। বেকারত্বের অবসান। মোদী-শাহদের 'ডবল ইঞ্জিন' তত্ত্ব শুধু অকেজো নয়, অবিরত দূষণও ছড়ায়। তাই কর্ণাটকের মানুষ বিজেপির শোচনীয় হাল করে ছেড়েছেন। সেই সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতকে পথ দেখিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছেন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য রাজনীতির আলোচনার অন্যতম ভরকেন্দ্র কর্ণাটকে বিজেপির পরাজয়। বাংলার রাজনীতিতে বেকায়দায় পড়া বিজেপি, ফলে যে আরো সমস্যায় পড়বে একথা অস্বীকার্য। জীবন ও জীবিকার কঠিন লড়াইয়ে, বেকারত্বের তীব্র জ্বালায়, এ রাজ্যের মানুষ ও যুব সম্প্রদায় দেখছেন বিপুল দুর্নীতি, তৃণমূল ও বিজেপির বোঝাপড়া, মানুষকে ধর্মে, জাতিতে বিভাজিত করে ক্ষমতায় টিকে থাকার অপকৌশল। সেই সঙ্গে মানুষ দেখছেন বামপন্থীদের লড়াই, সাগরদিঘির ভোট। ভাবনার পরিবর্তন ঘটছে। তাই পরিস্থিতির আহ্বান, আরো প্রসারিত জোট আন্দোলনের পথ আরো সংহত করে, সংঘবদ্ধ শক্তির তীব্রতায় বিচ্ছিন্ন করতে হবে বিভাজনের শক্তিকে। □

আশিস মিত্র

দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে মেহনতীর জানকবুল লড়াই

দেবাশীষ রায়

আমাদের রাজ্যে ৮ জুলাই ২০২৩ অনুষ্ঠিত হল দশম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন। ১১ জুলাই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের জন্য ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ব্যালট পেপার গননা করা হয় গোটা রাজ্যের বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মনোনয়ন পর্ব থেকে ভোটগ্রহণ, সর্বশেষ গণনার দিন বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে কারচুপির অভিযোগ এবং গোটা রাজ্যজুড়ে ক্রমাগত হিংসা, সন্ত্রাস ও অর্ধশতের বেশি সাধারণ মানুষের (যাদের মধ্যে কয়েকজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী) মৃত্যুর ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট ১২ জুলাই নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে সমস্ত প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আদালতের নির্দেশের ওপর। একই সঙ্গে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ও গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ব্যালট পেপার সংরক্ষণের নির্দেশও দেন কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। ফলস্বরূপ যেখানে ভোটের পর নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি জারি করার কথা, সেখানে জেলা প্রশাসন থেকে ব্লক প্রশাসন হয়ে পঞ্চায়েত কর্মচারীদের ব্যবহার করে ব্লক এলাকায় নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ধরানো হচ্ছে কোর্টের আদেশের প্রতিলিপি সহ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা। যেখানে বলা হচ্ছে নির্বাচিত হলেও জয়ী পঞ্চায়েতের প্রতিনিধির ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তীতে শুধু আমাদের রাজ্যে নয় গোটা দেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এই ঘটনা নজিরবিহীন বলে মানছেন গোটা রাজ্যের খেটে খাওয়া গণতন্ত্রপ্রিয় মেহনতী মানুষ সহ রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের এক বৃহৎ অংশ।

১৯৭৭ সালে আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সূচনা হয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য ছিল সমাজের সব অংশের (মহিলা, গ্রামের গরিব এবং তপশিলি জাতি, আদিবাসী সহ সমস্ত মানুষ) জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত / পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ-এ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আহ্বানকে ধারণ করেই ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যন্ত গ্রামের পঞ্চায়েতগুলিই হয়ে উঠেছিল এক-একটি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের প্রতিমূর্তি। ১৯৭৮-এ পথ চলা শুরু করে সঠিক দিশায় রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অগ্রসর হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশ বিদেশের বহু সরকার বিশেষত গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সারা দেশে চালু করেন। অর্থাৎ যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মডেল হিসাবে গোটা দেশ তথা বিদেশের বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি পেয়েছিল আজ সেই রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সহ গ্রামের এক বিপুল অংশের সাধারণ মানুষ। কেবলমাত্র দুর্নীতির কারণে একটার পর একটা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বন্ধ হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত বামপন্থীরা প্রতিনিয়ত দাবি তুলেছিল দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক, কিন্তু পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একাংশের দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কারণে গোটা রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করা চলবে না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্য সুবিধা রাজ্যের মানুষকে অবিলম্বে দিতে হবে। দশম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনে দুর্নীতি অন্যতম প্রধান ইস্যু হিসাবে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় স্থান করে নিয়েছিল।

কার্যভার গ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্তমান নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হা রাজ্যে দশম পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করেন। ৯ জুন থেকে মনোনয়ন পর্ব চলে ১৫ জুন পর্যন্ত। ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে এক বিরাট সংখ্যক আসনে বিরোধী দলের প্রার্থী দিতে না দেওয়া বা ভয়-ভীতি মারধর-এর মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করানোর মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদলের জয়ী হওয়ার (গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮৬৫০টির মধ্যে ১৬,৮৬১টি আসনে, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯,২১৭টির মধ্যে ৩,০৯৮টি আসনে, জেলা পরিষদে ৮২৫টির মধ্যে ২০৪টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকদল জয়ী হয়) বিষয়টিকে নির্বাচন কমিশনের গোচরে এনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়, যারা বিভিন্ন স্তরে প্রার্থী হবেন তারা যাতে বিনা বাধায় নমিনেশন জমা দিতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যে বা যারা প্রার্থী হবেন তিনি সহ তার এজেন্ট সর্বোপরি গোটা গ্রামবাংলার মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহ নির্বাচনের দিন বিনা বাধায় ভোটদান সহ গোটা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক। বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আমাদের রাজ্যে হিংসা ও প্রাণহানির বিষয়টিকে সামনে রেখে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে নির্বাচন কমিশন যাতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানানো হয়। একইভাবে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচন কর্মী হিসাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে শিক্ষক রাজকুমার রায়ের নিহত হওয়ার বিষয়টিকে নজরে এনে ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনারকে পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে যৌথ মঞ্চ এবং ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে এ বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে সাক্ষাৎ করে পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রশাসনের উদাসীনতা এবং নির্বাচন কমিশনের নির্লিপ্ততার কারণে শুধুমাত্র মনোনয়ন

পর্বেই ১২ জন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনের মতোই বিভিন্ন ব্লক অফিসগুলিতে শাসক দল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা ব্যারিকেড তৈরি করে মনোনয়ন পেশে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু পঞ্চায়েতে সীমাহীন দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনগণের অসম লড়াই প্রত্যক্ষ করল বাংলার জনগণ। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছবি সহ দেখা যায় রাস্তা আটকে মনোনয়ন পেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন নির্বীকার। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই ছিল যে গ্রামে গ্রামে মানুষের প্রতিবাদী, প্রতিরোধী ভূমিকা জানকাবুল লড়াই যা স্মরণাতীতকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই মনোনয়ন পর্বের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন স্তরের মোট ৭৩৮৮৭টি আসনের মধ্যে ৫৩ হাজারের বেশি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৭৭৫০ আসনে এবং আই এস এফ-এর পক্ষ থেকে ৩ হাজারের বেশি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে ৫৬৩২১ আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। মনোনয়ন পর্বের পর শুরু হয় প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য সন্ত্রাস। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরে এক বিরোধী মহিলা প্রার্থীকে তার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে, যদিও গণতান্ত্রিক শক্তির বাধার মুখে পুলিশের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

মনোনয়ন পর্ব থেকে ঘটে চলা সন্ত্রাস, মানুষের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচন পর্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহারের বিষয়টি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে উপদেশ দিলেও নির্বাচন কমিশন রাজ্য পুলিশ দিয়ে নির্বাচন করানোর বিষয়ে অনড় মনোভাব দেখান। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির তিরস্কার ও আদেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের একেবারে শেষলগ্নে (বহু ক্ষেত্রে নির্বাচনের দিন সকালে) কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছালেও তাদের সঠিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরিকল্পনার সাযুজ্য না থাকায় ৮ জুলাই নির্বাচনের দিন পুনরায় সন্ত্রাসের বলি হন ১৬ জন মানুষ, আহত হন ১০০ জনের বেশি, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা, বৃদ্ধ, শিশু। আক্রমণ, ভোট লুঠ, সন্ত্রাস ১৬ জন মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি ২০২৩-এর নির্বাচন প্রত্যক্ষ করল মানুষের জেদি প্রতিরোধ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে মেহনতী মানুষের লড়াই নির্বাচনের দিন এই বার্তাই দিয়েছিল লুঠেরাদের হঠাতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তুলতেই হবে। ২০১৮-র স্মৃতিকে উসকে দিয়ে ভোটকর্মী হিসেবে ভোটগ্রহণ করতে গিয়ে মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পরবর্তীতে নিহত হন হুগলী জেলার শিক্ষক রেবতী মোহন বিশ্বাস।

১১ জুলাই গণনার দিন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রাপ্ত খবরে এবং পরের দিন সংবাদ মাধ্যমে আমাদের রাজ্য, দেশ এমনকি দেশের বাইরের বহু মানুষও জানতে পারল গণনা কেন্দ্রের ভিতরেও কিভাবে সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হয়েছে। ব্যালট পেপার লুঠ করা হয়েছে, এমনকি শাসকদলের পরাজিত প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থী প্রার্থীর পক্ষের ব্যালট পেপার মুখে পুর নিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন দিয়ে গণনার কাজ শুরু হওয়ার পরবর্তীতে যেই শাসকদল প্রত্যক্ষ করে যে মানুষের রায় বহু ক্ষেত্রেই তাদের বিপক্ষে যাচ্ছে, সাথে সাথেই তারা বিরোধী দলের প্রার্থী ও তাদের এজেন্টদেরকে আক্রমণ করে গণনা কেন্দ্র থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে। বহু ক্ষেত্রে প্রতিরোধের মুখে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যখন তারা দেখতে পায় বিরোধী বিশেষত বামপন্থী গণতান্ত্রিক প্রার্থী ও তাদের জোটসঙ্গীরা গণনার ফলাফলে বিজয়ী হয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা প্রশাসনকে ব্যবহার করে পুনর্গণনার নামে ফলাফলকে বদলে দিতে সচেষ্ট হয় এবং বহুক্ষেত্রেই প্রশাসনের সহায়তায় পরাজিত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণায় সফল হয় বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও তা প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়-২ নং ব্লকে বিজয়ী বিরোধী জেলা পরিষদ প্রার্থীকে জোরপূর্বক হারিয়ে দেওয়া হলে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ফলে ৪ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। প্রারম্ভিকভাবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছিল বামফ্রন্ট-কংগ্রেস ও আই এস এফ জোটের ভোটবৃদ্ধি ঘটেছে অপরদিকে শাসকদল এবং বিজেপির ভোটের হার হ্রাস পেয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসকদল ৩৮৩১৪টি আসনে (৮০০২ আসন দখল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়) বিজেপি ৭৯৪৮ আসনে এবং বাম কংগ্রেস আই এস এফ জোট ৭১২৪ আসনে জয়ী হয়। পঞ্চায়েত সমিতিতে তা শাসকের পক্ষে ৩১৭৪(৯৯১ আসন দখল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়) বিজেপি ২৩৪ এবং বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট ১৪৮টি আসনে জয়ী হয়। জেলা পরিষদে শাসকদল ১৬৯ (১৬টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়), বিজেপি ১০ এবং বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোট ১৩টি আসনে জয়ী হয়। পরবর্তী সময় থেকে আর কোনও ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে সমস্ত গণনাপ্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জমা পড়ায় সমস্ত ফলাফলের ওপর প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ হস্তক্ষেপ করে নির্বাচনে ফলাফল কার্যকরী না করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে নির্বাচনের গণনা সহ বিভিন্ন কারচুপি, যত্রতত্র ভোটের দিন ব্যবহৃত ব্যালট পাওয়া সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দশম পঞ্চায়েতে নিযুক্ত বিভিন্ন পি আর ও (পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার) দেরকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের কাছে হাজিরা দেওয়ার বিষয়টিও বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গণনা কেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার পাওয়ার বিষয়টিকে নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দিকে আঙুল তোলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এই ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিবাদ করে জানানো হয়, এ দায় নির্বাচন আধিকারিকদের, সংগঠনের নয়।

২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে তা আদৌ জনগণের মতামতের প্রকৃত প্রতিফলন নয়। আবার ঘোষিত ফলাফল থেকে এটাও স্পষ্ট যে বামপন্থী ও সহযোগী দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের হার অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে অপরদিকে শাসকদল ও বিজেপির প্রতি মানুষের সমর্থন কমেছে। এ কৃতিত্বের দাবিদার গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামগঞ্জের লড়াকু মানুষ লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে সম্ভাব্য সব বাধা চূর্ণ করেই আগামী দিনের সংগ্রামকে প্রসারিত করার বার্তা দিয়েছেন। লড়াই হবে বিরামহীন। পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে, রাজ্যে ও দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার। □

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
51st Year, 1st & 2nd Edition, May-June 2023
Regd. No. : 18484/71

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

কেরালার ত্রিবান্দ্রামের শিক্ষক সদন সভাগৃহে বিগত ১৩-১৪ মে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা। সভায় সভাপতিত্ব

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

করেন সভাপতি সুভাষ লাম্বা সহ অন্যান্য সহ-সভাপতিগণ।

সভায় প্রাথমিক প্রস্তাবনা করেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় ২০টি সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। সকলের বক্তব্য গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। উক্ত সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

(i) রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে যৌথ সংগ্রাম জারি থাকবে।

(ii) যে সব রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যৌথ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়নি তারা দ্রুত এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত করবেন। মে-জুন মাস নাগাদ জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

(iii) আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী সব রাজ্যে এক বা একাধিক ভেহিকল জাঠার পরিকল্পনা করতে হবে।

(iv) সমস্ত রাজ্য সদরে ৯ আগস্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হবে।

(v) ৩ নভেম্বর 'দিল্লী মার্চ'-এর জন্য এক লক্ষ কর্মচারীকে একত্রিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য রাজ্যভিত্তিক যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(vi) প্রচারের অংশ হিসাবে পোস্টার, ব্যানার, হোর্ডিং ও লিফলেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিল সভার আগে দেশের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীতে সংগঠনকে পৌঁছোতে হবে।

(viii) ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ কলকাতায় জাতীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পঞ্চায়েত যৌথ কমিটি মিলিতভাবে এই সভার আয়োজন করবে।

(ix) সংগঠনের অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষার কাজ নতুনভাবে শুরু হবে।

(x) সদস্য প্রতি @2 টাকা হারে সদস্য চাঁদা ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহকভুক্তির অর্থ

দেবব্রত রায়

কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(xi) যেসব রাজ্যের নির্ধারিত সময়ে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি তাদের ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে।

(xii) ৩০ জুনের মধ্যে কুপন বিতরণ করে ১৫ জুলাই-এর মধ্যে তার কাউন্টার ফয়েল সদর দপ্তরে জমা করতে হবে।

(xiii) পরবর্তী জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ৯-১০ সেপ্টেম্বর সুকোমল সেন ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

(xiv) ২৩ মে কুস্তিগিরদের ধর্ণায় সংগঠনগত ভাবে দিল্লী ও আশেপাশের রাজ্যের কর্মচারীরা সংহতি জানাতে উপস্থিত হবে।

সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

সুতপা হাজরা

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচীর কিছু মুহূর্ত

উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের সম্বর্ধনা

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৩-২৪-এর কৃতী দুই ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ থেকে। গত ২৫ মে

সুষমা খাঁ, বাঁকুড়া

'২৩ এবছরের উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫) বাঁকুড়ার সুষমা খাঁকে তাঁর বাড়ি গিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় বাঁকুড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে। সম্বর্ধনা জানাতে জেলা সম্পাদক মনোজ ব্যানার্জী-র সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুষমা খাঁ-র পিতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিকটিক্স বিভাগে পুরুলিয়া জেলায় কর্মরত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা সারেঙ্গাবাদ অঞ্চলের শ্রী শুভ্রাংশু সরদার এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে (প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬)। গত ২৭ মে '২৩ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি মহেশতলা ইউনিটের পক্ষ থেকে যৌথভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় শুভ্রাংশুকে। পুষ্পস্তবক সহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা এবং পেনশনার্স সমিতির মহেশতলা ইউনিটের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা ও বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে

শুভ্রাংশু সরদার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জওহরলাল নেহরুর লেখা একটি বই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক রজত সাহা, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। □

জেলা / অঞ্চলের নানাবিধ কর্মসূচীর কোলাজ

বীরভূম

আলিপুরদুয়ার

দক্ষিণাঞ্চল

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

হুগলী

পূর্বাঞ্চল

জলপাইগুড়ি

ঝাড়গ্রাম

মালদা

হাওড়া

মুর্শিদাবাদ

নদীয়া

উত্তর ২৪ পরগণা

পশ্চিম মেদিনীপুর

পূর্ব বর্ধমান

পূর্ব মেদিনীপুর

পুরুলিয়া

দার্জিলিং

পশ্চিম বর্ধমান

সেক্রেটারিয়েট সমিতির শতবর্ষ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বৃহৎ সংগঠন এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠনপর্বের অন্যতম পথিকৃত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বজ্রকঠিন এবং কর্মচারী স্বার্থবিরোধী কন্ডাক্ট রুলসকে অগ্রাহ্য করে ১৯২৪ সালে ১০ মার্চ রাইটার্স বিল্ডিংসে এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠি একই ধারা বজায় রাখে বরং ঐ কন্ডাক্ট রুলসকে আরো দানবীয় করে তোলে। এই সকল প্রশাসনিক বাধাকে উপেক্ষা করে, শাসকশ্রেণীর আর্থিক-সামাজিক সহ বহুমুখীন আক্রমণকে প্রতিহত করেই এই সংগঠন শুধুমাত্র কর্মচারীস্বার্থকে রক্ষা করেনি, একই সাথে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে পথিকৃতের ভূমিকা প্রতিপালন করেছে এবং এখনও করে চলেছে এই শতাব্দী প্রাচীন সংগঠনটি। সংগঠন-আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার অধিকারী এই সমিতির শতবর্ষে পদার্পণ—পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ক্রমবিকাশের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কারণ সারা ভারতবর্ষে সচিবালয় কর্মচারী সংগঠনের যৌথ আন্দোলনের শরিক হওয়া ও আন্দোলন পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করা এক বিরল ঘটনা।

শতবর্ষ উদ্যাপনের লক্ষ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীকে সভাপতি করে সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব ও প্রাক্তন নেতৃত্বকে নিয়ে একটি শতবর্ষ উদ্যাপন কমিটি তৈরী করা হয়েছে।

শতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত ২৬ মে, ২০২৩ সমিতির দপ্তর, সমিতি ভবনে শতবর্ষ উদযাপনের একটি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমে শহীদদের উদ্দেশ্যে শহীদবেদীতে মাল্যদান করার পর সমিতির রক্তপতাকা উত্তোলন করেন উৎসব কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহ বর্তমান সময়ের সংগ্রাম-আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অরুণাংশু ভট্টাচার্য্য। এছাড়া শতবর্ষের অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সমীর চট্টোপাধ্যায়, বাণী মুখোপাধ্যায়, মিলন দাস এবং উৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী।

এই দিনের অনুষ্ঠানে, সমিতির গঠনপর্বের অন্যতম নেতৃত্বত্রয়ী তথা কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতৃত্ব সুশীল দাস, নিতাইহরি করমজুমদার এবং অজয় মুখোপাধ্যায়-এর নামে সমিতির দুটি ঘর নামাঙ্কিত করা হয়।

সভার প্রারম্ভে গণসংগীত পরিবেশন করে সমিতির সাংস্কৃতিক টিম।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি ও শতবর্ষ কমিটির কার্যকরী সভাপতি আইনুল কাজী।

অনুষ্ঠানে সমিতির নেতা ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক প্রণব কর সহ বিভিন্ন সমিতির নেতৃত্বগণ উপস্থিত ছিলেন। □

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।